দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হিন্দুত্ব — পৃঃ ২৩

কবিগুরুর সমাজ-চেতনা — পৃঃ ২৫

৭৮ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা।। ৪ মে, ২০২৬।। ২০ বৈশাখ, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

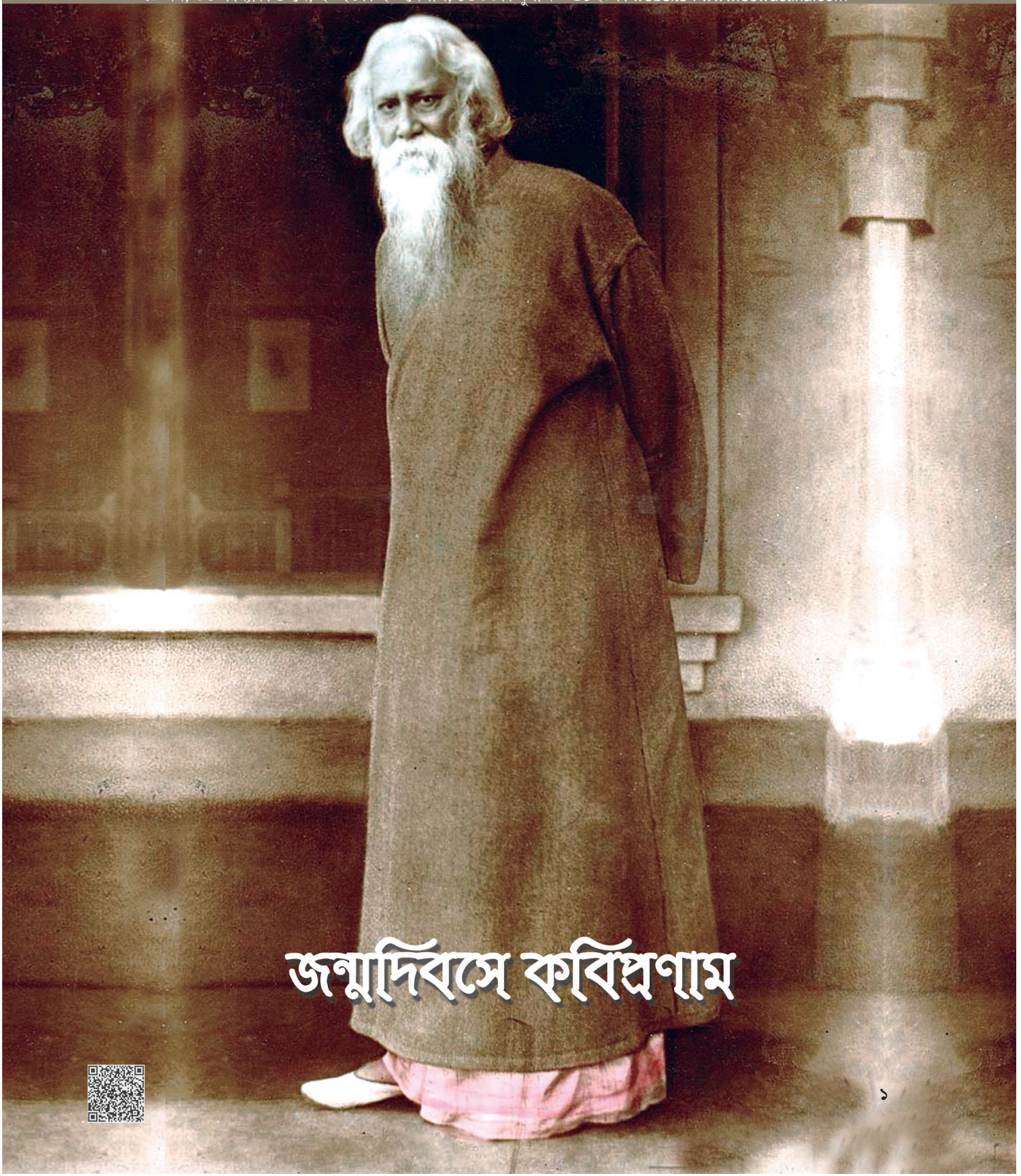

জন্মদিবসে কবিপ্রণাম

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা, ২০ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

৪ মে - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

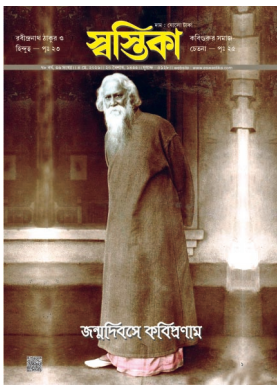

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

'হাতে পাঁজি মঙ্গলবার' তাই পূর্ণমাত্রায় ভোটদান—হাওয়া বদলের ইঙ্গিত—থরহরি কম্প □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

দেশের নিরাপত্তার বিষয়ে অজিত দোভালের মুসলমান সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বার্তা কি পরিবর্তনের ইঙ্গিত? □ অমল গুপ্ত □ ৭

বিচার বিভাগীয় আধিপত্য—অনুচ্ছেদ ১৪২-এর ব্যবহার এবং সাংবিধানিক ভারসাম্যের সংকট—একটি পর্যালোচনা □ পুলক নারায়ণ ধর □ ৮

বঙ্গ সংস্কৃতির সর্বনাশ করছে একশ্রেণীর বাংলা সংবাদমাধ্যম □ কৌটিল্য □ ১০

মহিলা সংরক্ষণ বিল এবং বিচিত্র রাজনীতি □ ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি □ ১১

ধিক্ সেকুলারিজম্! হিন্দু মেয়েদের সুরক্ষার কথা বলে না □ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ১৩

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও জীবনদর্শন □ ড. সমীর দাস □ ১৫

সাধুসন্তদের ওপর আক্রমণ প্রমাণ করল রাজ্য সরকার হিন্দু বিদ্বেষী □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হিন্দুত্ব □ রাজদীপ মিশ্র □ ২৩

কবিগুরু সমাজ চেতনা □ বৈশাখী কুণ্ডু □ ২৫

কাটোয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরের ক্রমবিকাশ □ সমীর কুমার চট্টোপাধ্যায় □ ৩১

কবিগুরুর ভাবনায় 'হিন্দুত্ব' □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৫

তোষণনীতির যূপকাষ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' □ দেবল চক্রবর্তী □ ৩৭

ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব ও মহানিষ্ক্রমণ □ গোপাল চক্রবর্তী □ ৪৩

এশিয়ার পরাধীন জাতির মুক্তিসূর্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র □ ড. দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৪৫

সীমাহীন নৃশংসতা : বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনে সরকারি নীরবতা আর কতদিন অব্যাহত থাকবে? □ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী □ ৪৮

গল্প কথায় ডাক্তারজী □ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

□ চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ রঙ্গম : ৩৯ □ সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □

প্রকাশিত হবে ১১ মে ২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১১ মে ২০২৬

রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনী বিশ্লেষণ

গত ২৩ ও ২৯ এপ্রিল দু'দফায় অনুষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। ভোট গণনা ৪ মে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় ভোটের ফলাফলের বিভিন্ন দিক নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক। সঙ্গে থাকবে অসম, কেরল, তামিলনাড়ু, পণ্ডীচেরি বিধানসভা নির্বাচনেরও বিশ্লেষণ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০/ টাকা (মোট ২৮০০/) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০/ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারতঋষি রবীন্দ্রনাথ

ভারতীয় সংস্কৃতি এক চিরন্তন ও শাশ্বত ধারা। সেই ধারাকে তিনি তাঁহার লেখনীর মাধ্যমে ভারতবাসীর হৃদয়-মনে সঞ্চারিত করিয়াছেন। ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতির গভীর সাধনা হইতে শুরু করিয়া ভারতীয় সমাজ, দর্শন ও রাষ্ট্রভক্তির এক যুগান্তকারী প্রেরণাপুরুষ যিনি, তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারত-সাধনার মাধ্যমে তিনি হইয়া উঠিয়াছেন ভারতীয় ঋষি। তাঁহার লেখনীর ছত্রে ছত্রে ভারতবোধের স্ফুরণ ঘটিয়াছে। ঋষিকবির দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ শুধুমাত্র ভূমিখণ্ড নহে, বিশ্বমানবের মহামিলন ক্ষেত্র। ভারতবর্ষকে তিনি মিলনতীর্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেই মিলনতীর্থের নাম দিয়াছেন 'মহামানবের সাগরতীর'। সেই সাগরতীর্থের আরাধ্য দেবতা হইলেন নরদেবতা। কবির এই বিশ্বময়তার ভাবরাশি ধরা পড়িয়াছে তাঁহার ভারততীর্থ কবিতায়। এই কবিতা এবং আরও বহু কাব্যে তিনি সেই নরদেবতারই বন্দনা গান গাহিয়াছেন। তিনি প্রকৃতার্থেই ভারতঋষি। তাঁহার শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জীবনযাত্রা প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের আদর্শে পরিচালিত। গুরু-শিষ্যের নিবিড় সাহচর্যে সেখানে সরল অনাড়ম্বর জীবন। সেখানে আরণ্যক পরিবেশে জীবনমুখী শিক্ষাদানের মাধ্যমে সাধনায় ব্যাপৃত আচার্যগণ। শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নহে, নৃত্য-গীত হইতে শুরু করিয়া হাতে-কলমে কৃষিকার্যের মাধ্যমে পল্লীউন্নয়নের সমস্ত শিক্ষাদান পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ করিয়াছিলেন গুরুদেব। ইহা কবির উপনিষদীয় সাধনার পরিণাম। তাই তাঁহার কাব্য ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হইল ভাবগভীরতা, নীতিনিষ্ঠতা, অধ্যাত্মচেতনা, ঐতিহ্যপ্রীতি, ইতিহাসবোধ, চিত্ররূপময়তা, প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, সৌন্দর্যচেতনা এবং ভাব-ভাষা-ছন্দের বৈচিত্র্য। তাহা সত্ত্বেও তাঁহাকে কোনো একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ করা যায় না। নানান প্রতিভায় ধনী তিনি। তিনি শিক্ষাবিদ, কবি, সহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, নাট্যকার, অভিনেতা, গীতিকার, সুরকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক। কাব্য ও সাহিত্যে উপনিষদের অপরিসীম প্রভাব তাঁহাকে ঋষিত্বে উন্নীত করিয়াছে। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বকে তিনি প্রকৃতি ও মনুষ্য জীবনের সান্নিধ্যে আনয়ন করিয়া সহজ ও কাব্যিকরূপে উপস্থাপন করিয়াছেন। উপনিষদীয় অদ্বৈততত্ত্বকে তিনি গীতাঞ্জলি-সহ বিভিন্ন কাব্যে ও কবিতায় ব্রহ্মের সহিত মিলন হিসাবে উপস্থাপনা করিয়াছেন। বহু কবিতা ও গানে তিনি ঈশ্বরকে বহু দূরের কেহ নহে, হৃদয়ের নিকটের এক পরম বন্ধু বা প্রেমিক হিসাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি উপনিষদকে কোনো শুষ্ক তত্ত্ব বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, তাহাকে জীবনের আনন্দময় অনুভূতি এবং কাব্য প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তিনিও ভারত-সাধক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই বিজাতীয় মতাদর্শের কতিপয় বাঙ্গালি তাঁহাকে বুর্জোয়া কবি বলিয়া উপহাস করিয়াছে। অতি বামমনস্ক তথাকথিত বিপ্লবীরা তাঁহার মূর্তি ভগ্ন করিয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীর হৃদয় হইতে তাঁহাকে বিন্দুমাত্র ম্লান করিতে পারে নাই। তিনি শুধু ভারতবাসীর নহেন, তিনি বিশ্ববাসীর। তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন, কিন্তু প্রখর রাজনীতি সচেতন। রাজনীতির সহিত সংস্রব না রাখিলেও তিনি সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন নাই। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে রাখিবন্ধন পালন কিংবা ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইটহুড উপাধি বর্জনের মাধ্যমে ইংরাজ শাসককে হুঁশিয়ারি প্রদান, সবই তাঁহার রাজনীতি সচেতন মনেরই বহিঃপ্রকাশ। তিনি স্বাদেশিকতার বরেণ্যপুরুষ। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে বন্দে মাতরম্ গাহিয়া তিনি তাহার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। বাল গঙ্গাধর তিলকের উদ্যোগে যে শিবাজী উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল, সেখানে তিনি সখারাম গণেশ দেউস্করের প্রেরণায় 'শিবাজী উৎসব' কবিতা লিখিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিলে দেশের পুনর্গঠন কীরূপে হইবে তাহা তিনি তাঁহার 'স্বদেশী সামাজ' প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ভারতবাসীর আত্মপরিচয় স্মরণ করাইয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দু হইল ভারতবর্ষের জাতিগত পরিণাম। ভারতবর্ষে বসবাসকারী সকলেই হিন্দু। বস্তুত তিনি ভারতবাসীকে জীবনের সর্বদিকের সহিত পরিচিত করাইয়াছেন। কবির জন্মদিবসে তাঁহার শ্রীচরণে আমাদিগের শত শত প্রণাম।

সুভাষিতম্

দশপুত্রসমা কন্যা দশপুত্রান্ প্রবর্ধয়ন্।
যৎফলম্ লভতে মর্ত্যস্তল্লভ্যং কন্যয়ৈকয়া।। (স্কন্দপুরাণ)

অর্থ ঃ একটি কন্যাসন্তানই দশ পুত্রের সমান। দশ পুত্রের লালনপালনে যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়, এক কন্যা পালনেই সেই ফল লাভ হয়ে থাকে।

‘হাতে পাঁজি মঙ্গলবার’ তাই পূর্ণ মাত্রার ভোটদান— হাওয়া বদলের ইঙ্গিত

থরহরি কম্প

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

এই নিবন্ধটি পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর আগেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ১৪২টি আসনে দ্বিতীয় পর্বের ভোট হয়ে যাবে। এ রাজ্যে কারা ক্ষমতায় আসবে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এবারের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম পর্বের ১৫২টি আসনে বর্তমান শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে বিদায় জানানোর ভোট পড়েছে বলেই অনেকের ধারণা। দ্বিতীয় পর্বেও তা নিশ্চিতভাবে অব্যাহত থাকবে। যদিও প্রথম পর্বে ৯০ শতাংশের ওপর ভোট পড়ার পর আগমার্কা দেশবিরোধীরা ‘এসআইআর’-এর কুপ্রভাবের যুক্তি দিচ্ছে। ‘এসআইআর’-এর কারণে এ রাজ্যের ভোটাররা অসন্তুষ্ট এবং এই অসন্তোষের কারণেই বিপুল সংখ্যক ভোট পড়েছে বলে তাদের কুযুক্তি। বাস্তব এর ঠিক বিপরীত। ৯৩ শতাংশ ভোটদান শাসক দল তৃণমূলের থরহরি কম্প লাগিয়ে দিয়েছে।

এ রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়াতে (প্রথম পর্বে নির্বাচন হওয়া) ১৫২টি আসনে ১৮ লক্ষ ভোট বাতিল হওয়ার পরেও আরও ২৪ লক্ষ বাড়তি ভোট পড়ার অর্থ তা অবশ্যই শাসক বিরোধী ভোট। ওই আসনগুলিতে প্রায় ১০ শতাংশ ভোটদান বৃদ্ধি পাওয়ায় তৃণমূলের নাকানি চোবানি অবস্থা। সকলেই ২০২১-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে অঙ্ক কষলেও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে এ রাজ্যে ৭৯ শতাংশ ভোট পড়েছিল। তাহলে ভোটদান বৃদ্ধি আসলে ধরা উচিত ১৪ শতাংশ। এর থেকে এসআইআর-এ বাদ যাওয়া ভোটারদের বিষয়টি ধরলেও ভোটদান বৃদ্ধির হার কোনোভাবেই ১১ শতাংশের কম হবে না। আর ভোটদানও ৯০ শতাংশের নীচে নামবে না। ২০ বছরে (২০০৫-২০২৫) বিহারে প্রায় ২১ শতাংশ ভোটদানের হার বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তা ৫ শতাংশ কমেছে। ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় ৮৪ শতাংশ ভোট পড়ার পর পশ্চিমবঙ্গে ভোটদানের হার ৫ শতাংশ কমে যায়। সেই কমতে থাকা হার যদি আচমকা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, তবে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিতে হয় তা হলো শাসক-বিরোধী ভোট। তৃণমূল কংগ্রেস দল নিজেরাই বিভ্রান্ত যে, কোন দিকে ভোট পড়ছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নির্বাচন-বিজ্ঞানের ভাষাতেও এই অতিরিক্ত ভোটদানের হার শাসক-বিরোধিতার প্রতীক হিসেবেই চিহ্নিত। তা মিথ্যা প্রমাণ হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নতুন করে লিখতে হবে। নির্বাচনী সমীক্ষা বিজ্ঞানকে ভুল প্রমাণের সেই ব্যর্থ চেষ্টাই চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস।

রাজ্যবাসীর সঙ্গে তৃণমূল কোনোদিন শাসকের ব্যবহার করেনি। ‘শাসকের ব্যবহার’ অর্থ— শাসকের পক্ষ থেকে রাজ্যবাসীকে সুশাসন প্রদান। ২০১১ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এ রাজ্যে তাদের স্বল্প মেয়াদের শাসন হবে ধরে নিয়ে তারা শাসনের বদলে লুঠপাট আর দুর্নীতিতেই বেশি মনোনিবেশ করে। ফলে রাজ্যের কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। অনেকে বলেন, তারা প্রাপ্য ডিএ থেকে রাজ্য সরকারি কর্মীদের বঞ্চিত করে এবং রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় ফান্ড ডাইভার্ট করে, সেই টাকায় ভাতা দিয়ে একাংশ রাজ্যবাসীকে সন্তুষ্ট রেখেছিল। তাদের ৩৭ জন নেতা-মন্ত্রী জেল খেটেছে আর একডজনেরও বেশি নেতা-মন্ত্রী জেল খাটার অপেক্ষায় রয়েছে। কানাঘুঁষো চলছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অচিরে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে শীর্ষ আদালত। এক বিচক্ষণ আইনজ্ঞের মতে, ২০২৬-এর রাজ্য বিধানসভা ভোটে যদি বিজেপি জেতে তাহলে তৃণমূলনেত্রীর জেল অবশ্যম্ভাবী। না জিতলে জেল হবে প্রতীকী। কর্তব্যরত ইডি আধিকারিকদের কাজে বাধা দেওয়ায় জন্য তাঁকে নাকি গারদে যেতেই হবে। ২০২৬-এর ভোটে এ রাজ্যে যে পরিমাণে শাসক-বিরোধী হাওয়া বইছে, তাতে তৃণমূল সরকারের বিদায় যে নিশ্চিত তা শাসক দলের অন্দরে অনেকেই মেনে নিচ্ছেন।

এবারের ভোটে ৭৪ জন বিধায়ক আর ৪ জন মন্ত্রীকে বাদ দিয়েছে তৃণমূল। নির্বাচনের সময় তারা কেউ ছেড়ে কথা বলবে বলে মনে হয় না। ২০০১-এর ভোটে ৮৪ জন বিধায়ক আর ৬ জন মন্ত্রীকে বাদ দিয়েছিল বিদেশি বামেরা। তাতে শেষ রক্ষা হয়নি। সিপিএম হেরে যায়। সেবার তারা ১৪৩টি আসন পায় । জোট (বামফ্রন্ট) থাকায় সে যাত্রায় তাদের সরকার বেঁচে যায়। তবে পুরো বামফ্রন্ট আমলের মধ্যে সেবার সবচেয়ে কম আসনে (১৯৯) জিতেছিল বাম জোট। তৃণমূলের কোনো আনুষ্ঠানিক জোট নেই। ভরাডুবি হলে একারই হবে । এমনও রটেছে যে, তৃণমূলের আসন ১০০-র নীচে নেমে যেতে পারে। ভোটদানের নিরিখে যেমন চমক ঘটেছে, তৃণমূলের আসন নিয়েও তেমন কিছু হয়তো একটা ঘটতে পারে। ২০১১-তে বাম জোট ২৩৫ থেকে ৬২ তে নেমে আসে আর সিপিএম পেয়েছিল মাত্র ৪০ আসন। সেবার মাত্র ২.০৩ শতাংশ ভোট বেশি পড়েছিল। এবার প্রথম দফার ১৫২টি আসনে ৯৩ শতাংশ ভোট পড়ার ব্যাখ্যার (দেশবিরোধীদের দেওয়া ব্যাখ্যা) অধিকাংশই ‘এসআইআর’-বিরোধী। ভোটের হাওয়ার সঙ্গে ভোটদানের হিড়িক মিশে থাকে । বিদেশি বামেরা গায়ের জোরে শাসন চালাত। এ রাজ্যে ১৯৭৭ সালের পর থেকে প্রায় তেরোটি ভোটে ২০০-র বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। তুলনায় ২০২৬-এর প্রথম দফায় ১৫২টি আসনের ভোট নিশ্চিতভাবে ব্যতিক্রম। ২০১১ সালের পর এরকম রক্তপাতহীন ভোটের নজির নেই বললেই চলে। ১৯৭২ সালে এ রাজ্যে ৬৬ শতাংশ ভোট পড়েছিল। বামেরা ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যখন ক্ষমতায় আসে, সেইবার ১০ শতাংশ কম ভোট পড়েছিল। ৩৪ বছর ধরে ভোটার তালিকায় জল ও ভূতুড়ে ভোটার ঢুকিয়ে, আর রিগিং ও বুথ দখল করে ছাপ্পা মেরে ক্ষমতায় আসত বিদেশি বামেদের দল। ২০১১-র সিপিএমের মতো এবারও নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের জাদুদণ্ড নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। দ্বিতীয় দফার নির্বাচন নির্বিঘ্নে, রক্তপাতহীনভাবে উত্তীর্ণ হলে বলতে হবে ‘জয়তু কমিশন’। মানুষ জিতবে। জিতবে ভারতের গণতন্ত্র। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

দেশের নিরাপত্তার বিষয়ে অজিত দোভালের মুসলমান সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বার্তা কি পরিবর্তনের ইঙ্গিত?

অমল গুপ্ত

সম্প্রতি ভারতের প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধান তথা বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল বৃদ্ধ বয়সেও দেশের নিরাপত্তার বিষয়ে জরুরি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেশের নিরাপত্তার বিষয়ে তিনি একটি জরুরি বৈঠক করেন। ওয়াকফ সম্পত্তি ভোগ করছে দেশের ধনী মুসলমানেরা, বাকি ৯৯ শতাংশ অশিক্ষিত, অবহেলিত, দারিদ্র্য-পীড়িত মুসলমান সম্প্রদায় ক্ষোভে ফুঁসছে। দেশের প্রায় ২০ শতাংশ মুসলমানদের অধিকাংশের মধ্যে কোনো উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এই ক্ষোভ, এই চরম দারিদ্র্য একদিন দেশবিরোধী, উগ্রপন্থায় পর্যবসিত হতে পারে এবং মোল্লাবাদীদের হাত শক্ত করতে পারে। সেই দিকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার তীক্ষ্ণ নজর ছিল বলে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে হওয়া গোপন বৈঠকের সূত্র থেকে জন্য যায়। এর আগে স্পষ্ট বক্তা, দেশের প্রাক্তন গোয়েন্দা-প্রধান অজিত দোভাল বলেছিলেন যে, গান্ধীজী নয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভয়ে ইংরেজরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীকে ব্রিটিশরা যথেষ্ট ভয় পেত।

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের আগে যে সব খবর সামনে আসছে তাতে রাজ্যে পরিবর্তন আসছে তা প্রায় ধরেই নেওয়া যায়। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োয় দেখা যায় যে, কলকাতা পুলিশের এক কর্মী ভয়ডর না করে প্রকাশ্যে বলছেন— কলকাতা পুলিশের 'ইসলামীকরণ'-এর চক্রান্ত চলছে। কলকাতার নিউটাউন-সহ পূর্ব কলকাতা ভেরি অঞ্চলের সমগ্র জলাভূমি 'রামসর সাইট' হিসাবে পরিচিত। জলাভূমি সংরক্ষণের বিষয়ে ইরানের রামসরে অনুষ্ঠিত

বিশ্ব সম্মেলনে পূর্ব কলকাতা জলাভূমিকে 'রামসর সাইট' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বাম আমলের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত এ রাজ্যের কোনো শাসকই এই 'রামসর সাইট'কে কোনো গুরুত্ব দেননি। পরিণামে এই অঞ্চলের অধিকাংশ জলাজমি বেদখল হয়ে গিয়েছে। কলকাতার সব জল নিষ্কাশনের অন্যতম পথ অবরুদ্ধ। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে বামফ্রন্ট আমলে হাজার হাজার অবৈধ বাড়ি নির্মাণ হয়েছে। বেআইনি কংক্রিটের জঙ্গল ধ্বংসের মাধ্যমে সেই বিশাল জলাশয়মগ্ন এলাকাকে পুনরুদ্ধার করে মাছের বিশ্ব বাজার করার চেষ্টা করার কথা সম্প্রতি উঠে এসেছে বিজেপির সংকল্পপত্রে। এই অঞ্চলে মসজিদ গড়ার গোপন প্ল্যানের কথা ফাঁস করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন প্রশাসনিক ভবন ও প্রতিরক্ষা গবেষণা কেন্দ্রের কাছে মায়ানমার থেকে আগত অবৈধ রোহিঙ্গা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, যা দেশের নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তার বিষয়। এই অঞ্চল কলকাতার অভিজাত অঞ্চল বলে পরিচিত, যা দেশবিরোধী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে শ্রীভট্টাচার্য অভিযোগ করেন।

কলকাতা পুলিশ দেশবিরোধীদের রক্ষাকবচের কাজ করছে বলেও বিজেপি অভিযোগ করেছে। গত ১৫ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার পর বিভিন্ন রাজ্য থেকে পুলিশকর্তা ও কেন্দ্রীয় বাহিনী এ রাজ্যে এসে বহু জেহাদি, ক্রিমিনালকে গ্রেপ্তার করেছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির জনবিন্যাস পরিবর্তিত হয়েছে। এতবছর কলকাতার বিভিন্ন অনুপ্রাণিত সংবাদমাধ্যমের পেড নিউজ করা সাংবাদিকদের চোখে কিছুই পড়েনি। পশ্চিমবঙ্গের ৯৯ শতাংশ সাংবাদিকদের কোনো নিয়োগপত্র বা চুক্তিপত্র নেই। অনুপ্রেরণায় জারিত হয়ে, নবান্নের দেওয়া বিজ্ঞাপনকে সম্বল করে, রাজ্যের শাসক দলের দয়া-ভিক্ষা নিয়ে একতরফাভাবে তারা সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। নানারকম অলীক ভিউজ দিয়ে তারা সংবাদপত্রের পাতা ভরায়। নিউজ থাকে না। গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী সংবাদমাধ্যম যদি সৎ ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করত তবে এ রাজ্যে দেশবিরোধী চক্রের বাড়বাড়ন্ত হতো না। এছাড়া কলকাতার বাবু ক্লাসের মদ, মাংস, বিষাক্ত বিরিয়ানি কালচার বাঙ্গালি জাতির এই ধ্বংসাত্মক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে। মদ, মাংস, মাদক, মোবাইল যুবসমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এতদ্‌সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তনের বার্তা দিচ্ছে কলকাতার বিভিন্ন বাজার। বড়বাজারে গেরুয়া রঙের আবির ৯০ শতাংশ বিক্রি হয়ে গিয়েছে। সবুজ আবির ১০ শতাংশও বিক্রি হয়নি। এ কীসের বার্তা? □

বিচারবিভাগীয় আধিপত্য

অনুচ্ছেদ ১৪২-এর ব্যবহার এবং সাংবিধানিক ভারসাম্যের সংকট— একটি পর্যালোচনা

বিচার বিভাগ যদি প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করতে থাকে, তবে ভবিষ্যতে নির্বাচন কমিশন বা অন্যান্য সাংবিধানিক সংস্থাগুলোর স্বায়ত্তশাসন এবং তাদের কাজের স্বচ্ছতা কি আদৌ টিকে থাকবে? একটি সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ হওয়া উচিত ব্যতিক্রম হিসেবে, নিয়ম নয়।

পুলক নারায়ণ ধর

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এই পরিস্থিতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এসআইআর বা স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশন। ভোটার তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে এই এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে। ভারতের আরও কয়েকটি রাজ্যে এই এসআইআর প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে; সেখানে কোনো আপত্তি বা গোলমাল হয়নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই তালিকা তৈরি করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনকে বিস্তর বাধাবিপত্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনের এই কাজের জন্য রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ সহযোগিতা একান্তই কাম্য। কিন্তু এই রাজ্যে প্রথম থেকেই নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগিতা করে গেছে রাজ্য সরকার। এই কাজের জন্য যত সংখ্যক আধিকারিকের প্রয়োজন, রাজ্য সরকার সেই আধিকারিকদের নির্বাচন কমিশনের কাজে নিযুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু রাজ্য সরকার এই এসআইআর প্রক্রিয়াটিকে প্রথম থেকেই ব্যাহত করার পরিকল্পনায় নানা ফন্দিফিকিরে লিপ্ত ছিল।

কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মামলা করে এই এসআইআর প্রক্রিয়াটিকে এখানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে; উদ্দেশ্য ছিল বিলম্ব ঘটিয়ে পুরনো ভোটার লিস্টে, অর্থাৎ জাল ভোটার লিস্টে ভোট করানো। কিন্তু শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের এই উদ্দেশ্য শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। রাজ্য সরকার এই কাজের জন্য নির্বাচন কমিশনকে যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত আধিকারিককে যুক্ত করেনি।

শেষপর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভিন্ন রাজ্য থেকে এবং আমাদের রাজ্যের বহু বিচারককে (প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০) এই কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশে নির্বাচন কমিশনের এ ব্যাপারে আর করার কিছুই রইল না। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের তৈরি করা তালিকা প্রকাশ করা ছাড়া নির্বাচন কমিশনের আর কোনো গুরুদায়িত্ব নেই। এর ভালো-মন্দ যাই হোক, সবটাই সুপ্রিম কোর্টের দায়। এরপরেও আবার সুপ্রিম কোর্ট এদের উপর ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করেছে।

১৯ জন অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতিকে নিয়ে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে; অ্যাডজুডিকেশনে যাদের নাম বাদ যাবে, তারা এই ট্রাইব্যুনালে আবার আবেদন করতে পারেন। অর্থাৎ, সমস্তটাই একটি বিলম্বিত প্রক্রিয়া বা ধারার মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদ সুপ্রিম কোর্ট সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করলেন।

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন এবং ভোটার তালিকার 'বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা' (S.I.R.) সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের ১৪২ নং অনুচ্ছেদ প্রয়োগ কেবল একটি আইনি পদক্ষেপ নয়, বরং এটি ভারতের বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থার এক গভীর সংকটের প্রতিফলন। যখন দেশের সর্বোচ্চ আদালত প্রশাসনের প্রতিদিনকার কাজে হস্তক্ষেপ করে, তখন তা কেবল নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্বকেই খর্ব করে না, বরং বিচারবিভাগীয় সংযমের অভাবকেও প্রকট করে তোলে। এই ধরনের অতিসক্রিয়তা 'বিচারবিভাগীয় দেউলিয়াত্ব'-এরই নামান্তর, যেখানে আদালত আইন ব্যাখ্যার পরিবর্তে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করে। এটি একটি চিরন্তন বিতর্ককে পুনরায় উসকে দিয়েছে— 'সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার' এবং 'বিচারবিভাগীয় অতিসক্রিয়তা'-র মধ্যে সীমারেখাটি ঠিক কোথায়? যদিও আদালত তাদের এই পদক্ষেপকে ভোটাধিকার রক্ষার সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে দেখছে। সমালোচকদের মতে, এই ধরনের হস্তক্ষেপ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতার লক্ষণ এবং এটি কেবলমাত্র অত্যন্ত বিরল বা 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' (rarest of the rare) ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত।

বিচার বিভাগের অসাধারণ ক্ষমতা কেবলমাত্র তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন তা একান্ত প্রয়োজন। যদি ১৪২ নং অনুচ্ছেদের ব্যবহার রুটিনমাফিক হয়ে যায়, তবে এটি তার গুরুত্ব হারায়। এটি একটি বিপজ্জনক নজির তৈরি করে, যেখানে নির্বাহী শাখা বা নির্বাচন কমিশন মনে করতে পারে যে তাদের নিজস্ব কাজের ত্রুটি আদালতই সংশোধন করে দেবে, যা তাদের দায়বদ্ধতাকে কমিয়ে দেয়।

ভারতীয় সংবিধানের ১৪২(১) নং অনুচ্ছেদ সুপ্রিম কোর্টকে এমন

যেকোনো ডিক্রি বা আদেশ জারি করার ক্ষমতা দেয়, যা তাদের সামনে বিচারাধীন কোনো মামলা বা বিষয়ে 'সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার' করার জন্য প্রয়োজনীয়। এটি একটি অনন্য এবং অসাধারণ ক্ষমতা, যা মূলত আইনি জটিলতা বা আইনের সীমাবদ্ধতার কারণে ন্যায়বিচার ব্যাহত হলে তা দূর করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

সংবিধান প্রণেতারা এটিকে একটি সেফটি ভালভ বা সুরক্ষা কবচ হিসেবে ভেবেছিলেন, যাতে কোনো অনন্য পরিস্থিতির ক্ষেত্রে আদালত অসহায় না হয়ে পড়ে। তবে, 'সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার' শব্দটির কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকায়, এটি কখন ও কীভাবে প্রয়োগ করা হবে, তা নিয়ে আদালতের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১৪২ ব্যবহার করে আদালত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয় ঃ

১. বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের মোতায়েন ঃ আপত্তির বিশাল চাপ সামলাতে আদালত পশ্চিমবঙ্গের বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার কর্মকর্তাদের সহায়তায় তালিকা যাচাইয়ের নির্দেশ দেয়।

২. আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন ঃ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের আপিল শোনার জন্য আদালত প্রাক্তন হাইকোর্ট বিচারপতিদের নেতৃত্বে ১৯টি আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনের নির্দেশ দেয়।

৩. ভোটাধিকারের সময়সীমা ঃ এপ্রিল ২০২৬-এর আদেশে আদালত নির্দেশ দেয় যে, যেসব আপিল ২১ এপ্রিল (প্রথম দফার ভোটের জন্য) বা ২৭ এপ্রিলের (দ্বিতীয় দফার ভোটের জন্য) মধ্যে নিষ্পত্তি হবে, তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে একটি সম্পূরক ভোটার তালিকা তৈরি করতে হবে।

ভারতীয় সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদ নিয়ে প্রধান উদ্বেগ হলো ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির অবক্ষয়। যখন সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচনী তালিকা ব্যবস্থাপনার ছোটখাটো বিষয়ে, এমনকী অন্য রাজ্য থেকে কর্মী নিয়োগ বা তারিখ নির্ধারণ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করে, তখন তারা বিচারবিভাগীয় গণ্ডি পেরিয়ে নির্বাহী বিভাগের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সমালোচকদের মতে, এটি ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI)-এর মতো সাংবিধানিক সংস্থার স্বাধীনতাকে খর্ব করে। এটি 'আইন দ্বারা শাসন' (Rule of Law)-কে সরিয়ে 'আদালতের আদেশের শাসন' (Rule of the Court)-এর দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা একটি গণতান্ত্রিক দেশের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সংবিধানের ৩২৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নির্বাচন পরিচালনা এবং তার তত্ত্বাবধানের পূর্ণ অধিকার শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের (ECI)। এটি একটি সচেতন সাংবিধানিক পরিকল্পনা, যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়া রাজনৈতিক ও বিচারবিভাগীয় প্রভাবমুক্ত থাকে। সুপ্রিম কোর্টের এই হস্তক্ষেপ পরোক্ষভাবে এই বার্তা দিচ্ছে যে, নির্বাচন কমিশন তার দায়িত্ব পালনে অক্ষম। এটি নির্বাচন কমিশনের মতো একটি সাংবিধানিক সংস্থার নৈতিক মনোবল ভেঙে দেয় এবং একটি 'মোরাল হ্যাজার্ড' বা নীতিগত সমস্যার সৃষ্টি করে। কমিশন তখন আর স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পায়, কারণ তারা জানে যে, সামান্য জটিলতাতেই আদালত হস্তক্ষেপ করবে।

আইনি নীতি অনুযায়ী, অসাধারণ ক্ষমতা কেবল তখনই প্রয়োগ করা উচিত যখন অন্য কোনো বিকল্প পথ খোলা নেই। কিন্তু বর্তমানে প্রশাসনিক প্রতিটি ছোট সমস্যাকেই সুপ্রিম কোর্ট একটি সাংবিধানিক সংকট হিসেবে দেখছে এবং ১৪২ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ১৯টি ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের সরাসরি মাঠে নামানোর সিদ্ধান্তটি কোনো দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নয়, বরং এটি একটি সাময়িক 'ব্যান্ড-এড' পদ্ধতি। এটি ব্যবস্থার গভীরের পচনকে আড়াল করে কেবল তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতির বদলে আদালতের ওপর এই নির্ভরশীলতা পরিকাঠামোগত সংস্কারকে ধামাচাপা দিয়ে দিচ্ছে।

ভারতের গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো ক্ষমতার পৃথকীকরণ,অর্থাৎ বিচার বিভাগ, আইনসভা এবং নির্বাহী বিভাগের কাজ আলাদা থাকবে। যখন আদালত নির্বাহী বিভাগের কাজ করতে শুরু করে, তখন তারা কার্যত বিচারবিভাগীয় নিরপেক্ষতা বিসর্জন দেয়। আদালত যখন নিজেই প্রশাসক হয়, তখন সেই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কে বিচার করবে? একই ব্যক্তি বা সংস্থা বিচারক ও প্রশাসক;উভয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে সেখানে স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest) অনিবার্য। এই প্রক্রিয়ায় আদালত রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে চলে আসে এবং বিচার বিভাগ যে নিরপেক্ষতার প্রতীক, তা জনমানসে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী পরিস্থিতি কেবল ভোটার তালিকার বিবাদ নয়, এটি ভারতের শাসনকাঠামোর এক গভীর সংকটের লক্ষণ। আদালত যখন নির্বাহী বিভাগের জুতোয় পা গলাতে শুরু করে, তখন সেটি ন্যায়বিচারের জয় নয়, বরং দেশ হিসেবে আমাদের সক্ষমতার ব্যর্থতা। সুপ্রিম কোর্টের উচিত নির্বাহী বিভাগকে তাদের দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা, নিজে সেই দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া নয়। যদি আদালত ক্রমাগত ভারতীয় সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদকে একটি 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে, তবে তা দীর্ঘমেয়াদে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাই খর্ব করবে। এটি কেবল বিচারবিভাগের অতিসক্রিয়তা নয়, বরং সাংবিধানিক মর্যাদা লঙ্ঘনের এক নজিরবিহীন উদাহরণ।

বিচার বিভাগ যদি এভাবেই প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করতে থাকে, তবে ভবিষ্যতে নির্বাচন কমিশন বা অন্যান্য সাংবিধানিক সংস্থাগুলোর স্বায়ত্তশাসন এবং তাদের কাজের স্বচ্ছতা কি আদৌ টিকে থাকবে? একটি সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ হওয়া উচিত ব্যতিক্রম হিসেবে, নিয়ম নয়। □

শোকসংবাদ

দক্ষিণ কলকাতার পাটুলী শাখার স্বয়ংসেবক বলরাম কাছাড় দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ২৮ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ২ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি উত্তরবঙ্গ প্রান্ত অভিভাবিকা তথা পূর্বতন মালদহ জেলা কার্যবাহিকা, সম্ভাগ কার্যবাহিকা শ্রীমতী বন্দনা রায় গত ১৯ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

* * *

স্বস্তিকা পত্রিকা পরিবারের দীর্ঘদিনের কর্মী তথা পত্রিকার মুখ্য রূপকার অজিত ভকতের মাতৃদেবী নির্মলা ভকত গত ১৭ এপ্রিল তাঁদের ঝাড়গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ পুত্রবধূ, ২ কন্যা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

বঙ্গ সংস্কৃতির সর্বনাশ করছে একশ্রেণীর বাংলা সংবাদমাধ্যম

বিগত বহু দশক ধরে 'পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালি সংস্কৃতি' বলতে বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত মিডিয়া বা সংবাদমাধ্যম যা বিক্রি করার চেষ্টা করছে তা জেহাদি মার্ক্সবাদী ও মাওবাদী অপসংস্কৃতি মাত্র। উদ্দেশ্য— রাষ্ট্রবিরোধিতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ বিক্রি। মূল ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে বাঙ্গালিকে আলাদা করে দেওয়া হলো তাদের দীর্ঘদিনের লক্ষ্য। ২০১১ থেকে এ রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস দল এর মাধ্যম মাত্র। একসময় উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি থেকে আন্দোলন শুরুর কারণ— ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতকে আলাদা করা। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের অধিকাংশকে নিকেশ করে দিলেও বাকিরা মিশে যায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা, মিডিয়া ও সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে। প্রথম পর্যায়ে ছিল প্রিন্ট মিডিয়া। পরে যুক্ত হয় ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া। এই দুই ধরনের মিডিয়া রাজ্যবাসীর এমন মস্তিষ্ক প্রক্ষালন শুরু করে যাতে এ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা, সংস্কৃতি জগৎ ও প্রশাসনে লুকিয়ে থাকা মাওবাদীরা মানুষের চোখে ধরা না পড়ে। ১৯৭৩-এর আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ, ১৯৭৫ সালে ভারতে জরুরি অবস্থা, ১৯৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টদের ৩৪ বছরের অপশাসন, এ রাজ্যের শিক্ষার রাজনীতীকরণ, শিল্প উঠে যাওয়া, ভূমি সংস্কারের নামে হিন্দুদের জমিজমা, সম্পত্তি লুঠ, তপশিলি জাতি-উপজাতিদের জমি মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়া থেকে সিঙ্গুরে টাটার কারখানা বন্ধ— সব বিষয়েই রাজ্যবাসীকে ভুল বুঝিয়েছে এই মূলধারার বাংলা সংবাদমাধ্যম। এ রাজ্যের স্কুল-কলেজের বস্তাপচা সিলেবাস, ভেঙে পড়া চিকিৎসা ব্যবস্থা, ভেঙে পড়া গণ-পরিবহণ ইত্যাদির বিষয়ে এরা কোনোদিনও মুখ খোলেনি। দুবাই, কিউবা বা পূর্ব ইউরোপের মিথ্যা তারিফ করা বাংলা সংবাদমাধ্যম দেশের বিভিন্ন সংকটের মুহূর্তে ভারতীয় সেনার ভালো কাজের প্রশংসা থেকে ছিল শতহস্ত দূরে। সাম্প্রতিক কালে এই মূলধারার বাংলা মিডিয়ার মিথ্যাচারিতার পরিমাণ জানতে হলে বাংলা মিডিয়ায় প্রচারিত ইরান সম্পর্কিত খবরগুলো ঘেঁটে দেখতে হবে। ইরান সম্পর্কে এরা বলছে যে, ইরান হলো আড়াই হাজার বছরের পার্সি সভ্যতা ইত্যাদি।

কিন্তু বাস্তব ঘটনা হলো, ১৩০০ বছর আগে পার্সি সভ্যতা ইরানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং গোটা বিশ্বের মধ্যে এই সভ্যতা একমাত্র বেঁচে রয়েছে ভারতে বসবাসকারী এক লক্ষ পার্সির মধ্যে। ইরানের সার্বভৌম সরকার বলে বাংলা মিডিয়া যেটা দেখাচ্ছে, বাস্তবে সেটা হলো একটি উগ্রপন্থী, মজহবি সংগঠন যার পোষা হার্মাদ বাহিনীর নাম--- 'আইআরজিসি'। গত ৪৮ বছর ধরে ইরানে কোনো স্বাধীন, সার্বভৌম সরকার নেই।

সংবাদমাধ্যমগুলি এখন শুরু করেছে বোঝানো যে, পশ্চিমবঙ্গ নাকি ভারত থেকে আলাদা। পশ্চিমবঙ্গের 'বাংলা সংস্কৃতি' বলে যা চালানো হচ্ছে, তা আসলে বাংলাদেশি ও কমিউনিস্ট অপসংস্কৃতির একটা মিশ্রণ। যদিও, ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রয়াণের সঙ্গেই বঙ্গীয় সংস্কৃতি কোমায় চলে গিয়েছে। তারপর থেকে বাংলাদেশি অপসংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিকে ক্রমাগত মিলিয়ে-মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হলো— পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা। ঠিক সেই কারণে কথায় কথায় 'বিজেপি বাংলা দখল করতে চায়'-নামক স্লোগানটি ভাসিয়ে দেওয়া হয় একশ্রেণীর মিডিয়ার পক্ষ থেকে। সেই 'বাংলা-বাঙ্গালি' সেন্টিমেন্টকে উসকে দেওয়ার অপকৌশল। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ যেন ভারতের বাইরের একটা সার্বভৌম দেশ, যা ভারতীয় জনতা পার্টি তথা ভারত দখল করতে চায়! বাংলা মিডিয়ার ভাবসাব এরকম যে, পাকিস্তান যেমন বাংলাদেশকে (পূর্ববঙ্গকে) আটকে রেখেছিল একসময়, ভারতও নাকি সেইভাবে 'পশ্চিমবঙ্গ'কে অধিকার করতে চায়!

ভারতের ইতিহাস বলে যে, বঙ্গভূমি মানেই ভারতবর্ষ আর ভারতবর্ষ মানেই বঙ্গভূমি। বঙ্গপ্রদেশ ও ভারতবর্ষ সমার্থক। ভারতীয় জাতীয়তাবোধের জনক হলেন কয়েকজন বাঙ্গালি। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, চন্দ্রনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋষি অরবিন্দ হলেন ভারতীয় জাতীয়তাবোধের জনক। বঙ্গপ্রদেশ ও বাঙ্গালিকে আপনজন না ভাবলে কয়েক বছর ইউরোপে কাটিয়ে দেশে ফেরার পরে কেন কংগ্রেস সভাপতি পদে সারা দেশ নেতাজীকে বসাবে? হিন্দুধর্মকে আদি শঙ্করাচার্য ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরে কারা নতুন করে সারা দেশে ও বিশ্বে ছড়ালেন? উত্তর— ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রমুখ মহাপুরুষ। একাধারে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। ১৯৪৭-এর পর কোনো বাঙ্গালি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হননি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বারবার দ্বিতীয় ক্ষমতাবান জায়গায় ছিল। বাঙ্গালি যদি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ না হতো, তাহলে অতুল্য ঘোষ, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়রা কীভাবে প্রভূত ক্ষমতাবান হয়েছিলেন? কেন ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক অটলবিহারী বাজপেয়ীজী?

মোদীজীর প্রধানমন্ত্রিত্বে অধিকাংশ কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানে এতদিন ছিল বাঙ্গালি। এবার একেবারে নীতি আয়োগের মাথায়। সম্প্রতি নীতি আয়োগের ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. অশোক কুমার লাহিড়ী। অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাংক থেকে রেল, খনি, আইনি সংস্কার, শিক্ষা-গবেষণা-সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিকাঠামো উন্নয়ন এমনকী দেশের বাজেট সবকিছুর নীতি নির্ধারণের প্রধান দায়িত্বে থাকবেন একজন বাঙ্গালি। এখন যদি বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত একটি দৈনিক সংবাদপত্র বলে যে, সেনাপ্রধান পদে কেন বাঙ্গালি নেই— তার কোনো উত্তর কি দিল্লির কাছে রয়েছে? অনুব্রত মণ্ডলকে কি ভারতের সেনাপ্রধান বানালে প্রমাণ হবে যে, 'পশ্চিমবঙ্গ' ভারতের অংশ, নাকি ফুটো রংবাজ ভাইপোকে? সর্বক্ষেত্রেই যোগ্যতা বলে একটা ব্যাপার আছে তো? □

মহিলা সংরক্ষণ বিল এবং বিচিত্র রাজনীতি

ডঃ বাপ্পাদিত্য মাইতি

সম্প্রতি লোকসভায় কেন্দ্র সরকারের মহিলা সংরক্ষণ বিলটি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পাশ হয়নি। আর স্বভাবতই শুরু হয় নানা বিতর্ক। প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় অবস্থান ও স্পষ্ট বক্তব্য এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিল বিরোধীরা নিছক সংকীর্ণতার কারণে ব্যর্থ করতে চেয়েছেন। এই মনোভাবকে প্রধানমন্ত্রী ভ্রূণহত্যার মতো অপকর্ম বলে অভিহিত করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, মহিলা সংরক্ষণ বিলের প্রশ্নে অতি প্রগতিশীল তথাকথিত মুক্তমনা নারীবাদীরা কোথায়? এক সময় পশ্চিম ইউরোপে ধনী শ্রেণীর আবির্ভাবের সঙ্গে নারীবাদ শব্দটির উত্থান। ইউরোপে শ্রমবিভাজনের ক্ষেত্রটি ছিল লিঙ্গভিত্তিক। পুরুষদের জন্য বাইরের পৃথিবীর কর্মকাণ্ড বেশি স্বীকৃতি পেত। অন্যদিকে সন্তান পালন, সংসার সামলানো ইত্যাদির মধ্যেই নারীরা সীমাবদ্ধ থাকতেন। সোজা কথায় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কাছে প্রজনন ছিল গৌণ। ফলে এমন ভাবনার প্রায় দেড়শো বছর পরে ১৯৪৯ সালে ফরাসি মহিয়সী সিমোন দ্য বোভোয়া নারীর এই অবস্থানকে 'Second Sex' বলে অভিহিত করে তীব্র প্রতিবাদী হন। অবশ্য এর আগেও প্রতিবাদ শোনা গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে বুদ্ধিজীবী মেরি উলস্টোনক্রাফট এবং ঊনবিংশ শতকে জন স্টুয়ার্ট মিল মেয়েদের সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যখন ইউরোপ আবার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য পেতে থাকে তখনও মহিলারা নানা বৈষম্যের শিকার হতে থাকেন। শিল্প সাহিত্যেও নারী মূলত যৌন ভাবনার প্রতিফলক হিসেবে ব্যবহৃত হন। ফলে গড়ে উঠতে থাকে নানা সামাজিক আন্দোলন। মতাদর্শকে আশ্রয় করে জন্ম নেয় নারীবাদী আন্দোলনের নানা রূপরেখা। নানা নামে সে সব আন্দোলন পরিচিত হয় সমাজবাদী নারীবাদ (Social Feminism), উদারনৈতিক নারীবাদ (Liberal Feminism) ইত্যাদি। আবার পুরুষতন্ত্রকে নিছক শোষণযন্ত্র মনে করে গড়ে ওঠে র‍্যাডিকাল নারীবাদ। সোজা কথায় কীসে নারীর ভালো হবে তাই নিয়েই নারীবাদের চিন্তাভাবনা। দাস প্রথার চরম অমানবিক আচরণে যখন আমেরিকার কালো চামড়ার মানুষেরা বিধ্বস্ত তখন লেখা হয়েছে শ্রীমতী হ্যারিয়ট বীচার স্টো-র 'আঙ্কল টমস্ কেবিন'। দাস প্রথাকে নিয়ে চরম প্রতিবাদী হয়েছিলেন কৃষ্ণাঙ্গী নোবেলজয়ী ট্যোনি মরিসন। আবার শ্বেতাঙ্গ শোষণে তৃতীয় বিশ্বে নারীদের অসম্মানজনক অবস্থা নিয়েও নানা প্রতিবাদ মুখর দিক চোখ এড়ায় না।

জাগতিক কাজে বিপুল অবদান থাকা সত্ত্বেও যাঁরা এক তৃতীয়াংশ বা আরও কম ভাগ পান, তাঁদের সমান সুবিধার জন্য লড়াই হলো নারীবাদ। নারীবাদের সেই বিখ্যাত স্লোগান হয়ে ওঠে বিশ্বজয়ী 'Personal is political' অর্থাৎ নারীবাদ ব্যক্তি ব্যতীত হয় না।

স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহান চিন্তানায়ক চাইতেন ভারতীয় মহিলারা গৃহের প্রাচীর ভেঙে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে

স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহান চিন্তানায়ক চাইতেন ভারতীয় মহিলারা গৃহের প্রাচীর ভেঙে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে আসুন। রাজনীতি যেহেতু জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ তাই রাজনীতির ক্ষেত্রেও মহিলারা কেন পিছিয়ে থাকবেন?

আসুন। রাজনীতি যেহেতু জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ তাই রাজনীতির ক্ষেত্রেও মহিলারা কেন পিছিয়ে থাকবেন? যে র‍্যাডিকাল ও নেহরুভিয়ান মনোভাব উঠতে-বসতে বিজেপিকে মনুবাদী, ফ্যাসিস্ট বলে গাল দিয়ে দিনের কাজ শুরু করে, তারাও নারী ক্ষমতায়ন, বিশেষ করে রাজনীতির বৃত্তে নারীশক্তি সম্পর্কে ভাবিত নয়। গালভরা কথার অর্থহীন বৃষ্টি ছাড়া আর কী করেছে? কংগ্রেস এবং অনেক সময় তাদের শাগরেদ বামেরা তো কেন্দ্রে থেকেছে। নারী রাজনীতি নিয়ে তাদের ভাবনা কোথায়? অভিজাত পরিমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা, বিলেতের দামি পরিবেশে ছুটি কাটাতে অভ্যস্ত বাম মহিলা কমরেড, গান্ধী পদবির সুফলভোগী বিজাতীয় নেত্রীরা এতদিন পার্লামেন্টে কেন নারী শক্তির জাগরণ নিয়ে বিল আনেননি? বেশি সংখ্যক নারী রাজনীতির বৃত্তে এলে নিজেদের 'প্রগতিশীল'অবস্থান ও শক্তি বিপন্ন হবে বলে?

মাতৃভক্ত ও নারীশক্তিকে দেবী দুর্গার মতো অজেয় ও পবিত্র জ্ঞান করা নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী কিন্তু অন্য ভাবনার যাত্রী। তিনি রাজনীতিক নন। রাষ্ট্রনায়ক। ২০২৩ সালে বিজেপি তাঁর নেতৃত্ব একটি প্রস্তাব আনে। 'নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম' নামে পরিচিত মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। নারী শক্তির সামগ্রিক উন্নয়নে যেহেতু রাজনৈতিক শক্তি দরকার, সেজন্য লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় ৩৩ শতাংশ অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ মহিলা সংরক্ষণ প্রয়োজন। এক তৃতীয়াংশ আসনের মধ্যে তফশিলি জাতি, উপজাতির মহিলাদের জন্যও উপসংরক্ষণ অন্তর্গত হয়। সম্প্রতি লোকসভায় পেশ হওয়া ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিলটি দুই তৃতীয়াংশ ভোটের অভাবে বাস্তবায়ন হতে পারেনি। বিলটির উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের জন্য আসন সংখ্যা ৩৩ শতাংশ বাড়িয়ে লোকসভায় আসন সংখ্যা ৫৪৩ থেকে ৮৫০ করা। ১৯৭১ সালের জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে লোকসভার আসন ৫৪৩ করা হয়েছিল। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েও লোকসভার আসন বৃদ্ধি না পাওয়া বিস্ময়কর। কোনো কোনো লোকসভা আসনে ভোটার সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। এত বিপুল মানুষের জন্য মাত্র একজন সাংসদ! ডিলিমিটেশন ও ভোটার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে আসন বণ্টন পদ্ধতি নিয়ে শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক হয়। ২০২৩ সালে পাশ হওয়া 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' বিলটির সাহায্যে ১৪-১৫ শতাংশ নারীর প্রতিনিধিত্ব ছিল। তাকে বৃদ্ধি করে ৩৩ শতাংশ করতে চাওয়া সংশোধনী বিলটি পাশ না হওয়া দেশের নারীশক্তির সামগ্রিক প্রবাহের ক্ষেত্রে আরোপিত বাধা বলেই বিবেচিত হবে। বিলটি পাশ হলে লোকসভায় প্রায় ২৭৩টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হতো।

এ দেশে দিশাহীন বিরোধিতার জন্য নানা ভালো উদ্যোগের মৃত্যু বারবার হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও টাটার মতো শিল্প সাম্রাজ্যকে তাড়িয়ে সেখানে সর্ষেবীজ ছড়িয়ে রাজ্যবাসীর চোখে সর্ষেফুল ফোটানোর উদ্ধত অপচেষ্টা দেখা গেছে। যে স্বঘোষিত লিবারেল শক্তি কংগ্রেস ও তার স্যাঙাতদের কপি রাইট বলে দাবি করা হয়, তাঁরাও আজ বিলের বিরোধিতা করেন। তবে এ সময়ে সামাজিক মাধ্যম ও বিভিন্ন গণমাধ্যম অতি সক্রিয় থাকায় দেশবাসী বুঝতে পারছেন নারীদের প্রতি কারা শ্রদ্ধাশীল। সখের বশে দারিদ্রকে সঙ্গী করা নেত্রী, অতি 'প্রোগ্রেসিভ' দের নারী বিদ্বেষ আর লুকানো যাচ্ছে না। মার্কসবাদীরা, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র নামে বিচিত্র ভাবনায় মগ্ন কংগ্রেসিরা অনেক সময় গুরুঠাকুর এঙ্গেলসের কথা উদ্ধৃত করেন প্রগতিশীল সাজার বিচিত্র ভাবনায়। সেই এঙ্গেলস ব্যক্তি পরিসর বা দেশের ক্ষেত্রে নারীর বিশ্ব পরাজয় দেখে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের কথা বলেছিলেন। অথচ ভারতে নারীদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি করতে গেলে এঁরাই প্রতিবন্ধক হন।

নেহরুর উদ্ধৃতি আর ক্রিয়াকলাপকে সদম্ভে ঘোষণা করা বিচিত্র মিত্রবর্গ, ততোধিক বিচিত্র এক রাজ্যে সীমাবদ্ধ অথচ 'সর্বভারতীয়' শব্দ ব্যবহারকারী রাজনৈতিক দল, এঙ্গেলসকে ছুঁড়ে ফেলা বামাচারীরা নিছক মোদী বিরোধিতা করতে গিয়ে মাতৃশক্তিকে লাঞ্ছিত করলেন। দেশের 'প্রোগ্রেসিভ' নারী সংগঠনগুলির শীত-ঘুম সরীসৃপের মতো বিষাক্ত। ভারতের জাগ্রত নারীশক্তি আবার অসুররূপী এই সমস্ত অপশক্তিকে বিনাশ করবেন তাতে অণুমাত্র সন্দেহ নেই। □

With Best Compliments from-

A

Well Wisher

ধিক্ সেকুলারিজম!

হিন্দু মেয়েদের সুরক্ষার কথা বলে না

এই সংকীর্ণতা যদি কালকের আর একটা নাসিক টিসিএস ধর্মান্তরণ চক্র ঠেকাতে পারে তবে এ হবে শক্তিশালী ফলদায়ী উপকারী সংকীর্ণতা। লেন্সকার্টের চশমা পরে দেখতে পাচ্ছি? তুলসী মালা। সিঁদুর। চন্দন টিপ। তিলক। না তো। কিছুই দেখা মিলছে না। এমনই ম্যাজিক চশমা! কিন্তু হিজাব দেখা যাচ্ছে।

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

সেকুলারিজমকে এবার তো দায় নিতেই হবে। যদি ফ্রিজারে গোমাংস খোঁজ করা অপরাধ হয়, তাহলে আমার বাড়ির মেয়েটার ওপর যখন মোল্লাবাদের লোলুপ দৃষ্টি উঁকি দেয়— সেটাও কি সেকুলারিজমের অঙ্গ, অংশ, শক্তি, ভিত্তি? গলায় তুলসীমালা, কপালে চন্দন সিঁদুর থাকলে তা আনস্মার্ট গোঁড়ামি। কিন্তু হিজাব পরতে বারণ করলেই তখন তা ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত! বাঃ রে বাঃ! বোরখার জোর যদি চন্দন-হলুদ-সিঁদুর-তিলকের চাইতে এই দেশের প্রত্যেক স্তরে।। ক্ষেত্রে অধিক বল, কৌশল, কূট মতলব শক্তি বিস্তার করে, তখনও কি সেকুলারিজমের কাসুন্দি ঘেঁটেই যাব! কে কে নেবে এই ধ্বংসের দায়ভাগ? যারা বলে 'উগ্র হিন্দুত্ব', যারা বলে 'গৈরিক সন্ত্রাস', বা যারা চিবিয়ে চিবিয়ে সেমিনার করে 'স্যাফ্রন লাভ ট্র্যাপ'— সেই সব শহুরে বিলাসী সেকুলার, উদারবাদীরা কোনো এক আয়েশার বোরখা পরার পক্ষে শত যুক্তি দেয়। ইচ্ছে, রুচি, স্বাধীনতা, পোশাক কখনও ফ্যাক্টর নয় ইত্যাদি কথা আওড়ে যারা শুধুমাত্র আয়েশাদের বোরখা না খোলার কাতরতার খোঁজ রাখল, তারা কেন আজ একটাও আওয়াজ তুলল না বহুজাতিক সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস (টিসিএস)-এ কর্মরতা হিন্দু নারীদের ওপর জেহাদি সাঁড়াশি চাপের? কেন আওয়াজ নেই নামি সংস্থা লেন্সকার্ট-এর লিখিত হিন্দু বিরোধী ড্রেস কোডের ক্ষেত্রে? কেন ধিক্কার আসছে না যখন ভারতের বিভিন্ন শহরের জিমখানাতেও হিন্দু মেয়েদের উপর জেহাদি আক্রমণ চলছে সুকৌশলে? তাঁদের নানানভাবে প্যাঁচে ফেলা হচ্ছে, উদ্দেশ্য একটাই চাপ— প্রয়োগ করে, সম্মানহানির ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করার চোরাগলিতে ঢোকানো। যারা এই অপরাধ করছে যারা এই জঘন্য অপরাধ দেখে জেনেও না দেখার ভান করছে। কারণ মুখে সেকুলারিজমের তালা আঁটা এই ধ্বংসের দায় এদের দু'জনেরই সমান।

'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?
.... ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।'

স্থিতিস্থাপকতা আর টিকছে না। অন্তত টিসিএস নাসিকের কেলেঙ্কারির পর একটাই আতঙ্ক, ওরা কী চাইছে? সুযোগ পেলেই যে অভ্যস্ত করতে চাইছে আত্মসমর্পণের! রানি পদ্মাবতী এবং সমগ্র মাতৃমণ্ডলী আলাউদ্দিন খিলজির চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল রাজ্য দখল হলেই ধর্ম দখল করা যায় না। আত্মবিশ্বাস সচেতনতার প্রতীক হয়ে যাঁরা আছেন, সেই ভূমিতেই আজকের আধুনিক টেক স্যাভি মহিলারা কর্পোরেট চাকরিতে নিজেদের বেতন, সুযোগসুবিধা, ছুটি, বোনাসের সঙ্গে জুড়ে নিল চাপে পড়ে ধর্মান্তরণ। কেরিয়ারের বাধ্যবাধকতা হয়ে উঠল নাসিক টিসিএস-এর মানসিক বন্দিশালা। ১২ জন ভুক্তভোগী কর্মরতা আজ যন্ত্রণায় ফেটে পড়েছে। আরও আশ্চর্য এটাই, তাঁরা বারবার অভিযোগ করেন কিন্তু এইচআর ম্যানেজার নিদা খানের অবস্থা তথৈবচ। কারণ তিনিই তো মাস্টারমাইন্ড। কর্মস্থলে হয়রানি, যৌন শোষণের মাথা যে উনিই। তাই যত হয়রানির অভিযোগ এসেছে তিনি নিজেকে তাঁর 'মকসদে' তত বেশি সফল ভেবে আনন্দ ভোগ করেছেন। এখন টিসিএস বলছে নিদা আদৌ ওদের এইচআর ম্যানেজার নন। তিনি কোন অফিসিয়াল পদে ছিলেন সেটা জানার কোনো আগ্রহ কিন্তু কারও নেই। টিসিএস-নাসিকের ছাউনিতে দিনের পর দিন হিন্দু মহিলাদের উপর যৌন হয়রানি হয়েছে, তাঁদের ধর্মান্তরিত করার চক্রান্ত চলেছে, তাঁদের বেশভূষা, জীবনচর্যার ওপর আঘাত আনা হয়েছে, তাঁদের মুখ বন্ধ রাখারও চাপ দেওয়া হয়েছে— এই যত সব কিছুই হয়েছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হোক। কৃষ্ণা নামের এক মহিলার সঙ্গে এমন বিষাক্ত আচরণ করা হয় যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। আসিফ আনসারি, শফি শেখ, শাহরুক কুরেশি, রাজা মেমন-সহ তৌসিফ আত্তার, অশ্বিন চাইনানি এই নির্যাতন চক্রের পাণ্ডা। যারা মহিলাদের কাজের ছুঁতোয়, উইক-এন্ড মিটিং-এর চক্রব্যূহে এবং আরও নানান পেশাদারি উন্নতির ফাঁদে ফেলে তাদের শোষণ করা,

পরে মানসিক নির্যাতন, ব্ল্যাকমেইল করা, পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করানো এবং ধর্মীয় ভাবাবেগ ভুলে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য মগজধোলাই। একের পর এক ধাপ এবং দ্রুত ধাপ পরিবর্তন। আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল নাসিকের এই ঘটনা যে, মোল্লাবাদের শোষণ সব স্তরে সমান তালে বর্তমান। প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের ধর্মান্তরিত হওয়ার পর যখন ডেমোগ্রাফি বদলের অঙ্ক কষা হয় তখন কপালে ভাঁজ আসে। কিন্তু কর্পোরেট হাউসে হোয়াইট কলার জবেও যখন মোল্লাবাদের এত বড়ো থাবা, তখনও কি অপেক্ষাতেই থাকতে হবে যে, কোন কোন ধারায় অভিযুক্তরা ধরা পড়ল? তারপর একদিন দেখা যাবে যে, তারা জামিনও পেয়ে গেল। বিষয়টা কিন্তু দোষীদের শাস্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই আর। হিন্দু মেয়েদের যে অনেক বেশি সচেতন হওয়ার সময় এসেছে এটা প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত এবং সচেতনতা অনুশীলনের সময় হাজির। ধর্মান্তরিত করার মধ্যে এক মোল্লাবাদী সফলতার তৃপ্তি এবং ধর্ষকামী সুখ বিরাজ করে। মোল্লাবাদের জন্নত প্রাপ্তি এতে হয় কিনা তা তারাই জানেন।

হিন্দু মেয়েদের সচেতনই কেবল নয়, সন্দিহান থাকতে হবে দরকারে। ভারতের মধ্যে অপশক্তি যেভাবে বাসা বেঁধেছে সেকুলারিজমের দলিল হাতে, তার প্রতিপক্ষ হিসেবেই সবচেয়ে বড়ো সংস্কৃতি সংঘাতী অভ্যাস-সন্দিহান হতে হচ্ছে, যা আমাদের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ফল নয়, আত্ম সুরক্ষার কবচ। খুব সহজেই মেয়েদের টার্গেট করা যায়। কারণ মোল্লাবাদ মেয়েদের একটা commodity হিসেবে মাপে। ধর্মান্তরিত করার পর তাদের সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রনির্ভর দেহ হিসেবে পরিমাপ করে। জিমখানাগুলিও তাই দারুণ উর্বর জমি--- যেখানে সহজেই মেয়েদের কাছাকাছি আসা যায়। ২০১৯-২০২৫ সালের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র,গুজরাত, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরাখণ্ড থেকে একাধিক অভিযোগ, পুলিশি অভিযোগ দায়ের, এমনকী তদন্ত পর্যন্ত সংগঠিত হয়েছে— যেখানে বিভিন্ন মাল্টিজিমে মেয়েদের বিশ্বাস অর্জন করা, তাদের একান্ত মুহূর্তের ছবি সংগ্রহ, কখনও প্রেমের মিথ্যা অভিনয় ফাঁদে ধরে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিও তৈরি এবং ব্ল্যাকমেইল করা চলে। ধর্মান্তরিত হতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। মির্জাপুরের একটি জিমখানাতো বন্ধই হলো এই অভিযোগ অত্যন্ত চড়া হতে। এই বছর ২০ জানুয়ারি তাদের বিরুদ্ধে ধর্মান্তরণ, ধর্ষণ-সহ একাধিক মামলা দায়ের হয়। শেখ আলি, জাহির খান, ফাইজল খান-সহ একাধিক নারীলোলুপ মনুষ্যরূপী জানোয়ারকে আটক করা হয়। গত ডিসেম্বরে দেরাদুন থেকেও অনেক মহিলা এহেন জিম সংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনেন। ইন্দোর থেকে রামনগর, ভোপাল থেকে আলিগড় জিমে কখনও ফ্রি-ইনস্ট্রাক্টর দেওয়ার টোপ, তো কখনও নানান অফার চলে জিমে। অধিকাংশ সময়েই এই ধরনের অতিরিক্ত অফারে অত্যন্ত সচেতন সজাগ থাকার সময় এসেছে। জিমে যোগদান ইতিবাচক ব্যাপার ও বিশেষ প্রয়োজনীয়, কিন্তু কখন জিমে যাব, কোন ইনস্ট্রাক্টর কেমন আচরণ করছেন তাতে সজাগ থাকা দরকার। সর্বোপরি সাময়িক উৎসাহ আবেগে যেন জিম গৌণ না হয়। ধর্মান্তরণের চক্র নানান ভাবে আমাদের মগজ, ভাবনা, বোধ ও বুদ্ধিতে আফিম যোগ করে। অনেক সময়ই উদ্দেশ্য নিয়ে আসা মোল্লাবাদে নেশাগ্রস্ত ছেলেটা এমন আচরণ করবে মনে হবে সেই শ্রেষ্ঠ প্রিয়জন। প্রেমের কাল্পনিক নেশায় বুঁদ করলেই কেল্লাফতে। ধর্মান্তরিত করার দরজা তখন 'খুল যা সিম্ সিম্'। প্রত্যেকটি মেয়েকে অনেক বেশি পরিবার সংযোগ- বান্ধব থাকার সময় এসেছে। ভার্চুয়াল জগতেও অনেক সময়ই লাভ জেহাদ চক্র সক্রিয় থাকে। সামাজিক মাধ্যমে সংযোগ। আগে থেকেই নির্দিষ্ট মেয়েটির সব তথ্য, পারিবারিক ইতিহাস, দুর্বলতা জেনে যখন সামাজিক মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে, সম্পর্ক গড়ে, তখন বহু সময়ই কাঁচা মাথার মেয়েগুলো তাদের নিখুঁত অভিনয়ে মোহিত হয়। বিধি সম্মত সতর্কতা যেমন তামাকজাত দ্রব্যে, অ্যালকোহলের গায়ে লেখা থাকে, এমন সব সামাজিক যোগাযোগ, পরিচিতিতেও থাকুক সেই বিধিসম্মত সতর্কতা। শুনতে ভীষণ সংকীর্ণ ঠেকছে, ঠেকুক। এই সংকীর্ণতা যদি কালকের আর একটা নাসিক টিসিএস ধর্মান্তরণ চক্র ঠেকাতে পারে তবে এ হবে শক্তিশালী ফলদায়ী উপকারী সংকীর্ণতা। লেন্সকার্টের চশমা পরে দেখতে পাচ্ছি? তুলসী মালা। সিঁদুর। চন্দন টিপ। তিলক। না তো। কিছুই দেখা মিলছে না। এমনই ম্যাজিক চশমা! কিন্তু হিজাব দেখা যাচ্ছে। হেঁয়ালি নয়! লেন্সকার্ট লিখিতভাবে তাদের সংস্থার উপযোগী ড্রেস কোড এমন জবরদস্ত করেছে যেখানে তিলক থেকে টিপ সব নিষিদ্ধ। কিন্তু হিজাব পরা যাবে। চশমাতে ঠিক কত পাওয়ারের সেকুলারিজম লেন্স থাকলে এটাও চোখে পড়ে না 'আরবান ইন্টেলেকচুয়াল'দের! আরবানই— কারণ লেন্সকার্ট তো আর ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুরে নেই। আছে ঝাঁ চকচকে শহরে, রাজপথে, বড়লোক পাড়ায়।

যারা আজকেও ইনফিউশন খেতে খেতে স্যাফ্রন টেররে খুব আতঙ্কিত, অভিভাবকদের জন্য যারা ভাবে পুরো কালচারটাই ভেসে গেল— তারা লেন্সকার্ট ড্রেস কোডের ব্যাপারটা আর কবে দেখবেন, কবে শহুরে ভাষায় গালিগালাজ করবেন! অন্তত সমালোচনা। পপুলেশন ডেমোগ্রাফি, সোশিও-পলিটিকাল ফ্যাব্রিক বদল চর্চিত, বিতর্কিত। এবার যোগ হচ্ছে রিলিজিয়ান ট্র্যাপ— মজহবি ফাঁদ। মাছের চারা এবং বঁড়শিতে মাছ। ঠিক এই নীতিতেই লক্ষ্যবস্তু হিন্দু মেয়েরা। এই অবস্থায় একটাই কথা বলার- Secularism is irrelevant! সেই সেকুলারিজম ঘৃণ্য, যা মোল্লাবাদকে তোষণ করবে আর যার দ্বারা হিন্দু মেয়েরা আক্রান্ত হবে। □

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও জীবন দর্শন

ড. সমীর দাস

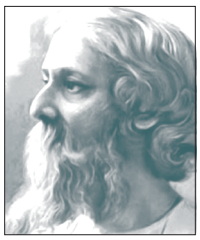

সর্বপ্রকার শিক্ষার অর্থই আদান-প্রদান—আচার্য দিবেন, শিষ্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আচার্যের কিছু দিবার বস্তু থাকা চাই, শিষ্যের গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লোকশিক্ষা, স্বামীজীর 'Man making' শিক্ষাদর্শ এবং ভগিনী নিবেদিতার জাতীয় শিক্ষাবিধির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবন অভিমুখী শিক্ষা সম্পর্কিত বক্তব্যগুলির একটি গভীর মিল লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষা সবার প্রথম এবং শিক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ সোপান সে কথা স্বামীজী স্বয়ং বলেছেন। শিক্ষাই পারে সমাজ, দেশ ও জাতিকে উন্নত থেকে উন্নততর শিখরে পৌঁছে দিতে। আবার ধর্মশিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেছেন।

স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার এ হলো ভাবগত দিক। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যেক শিক্ষা-চিন্তা নায়করাই শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্র সন্ধান করেছেন। বৃহত্তর জনসমাজ হলো শিক্ষার সেই বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্র। ভারতের দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষ যারা সমাজে নিম্নবর্ণে জন্মগ্রহণ করে পতিতরূপে অবহেলিত, তাদের কথাই সবচেয়ে বেশি ভেবেছেন স্বামীজী। তিনি দেখেছিলেন, পাশ্চাত্যে যে কোনো শ্রেণীতে, যে কোনো সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করলেও সেখানকার মানুষ একমাত্র শিক্ষার জোরেই সমাজে মর্যাদার স্থান পেতে পারে। পাশ্চাত্যের সামগ্রিক উন্নতির মূলেই আছে সর্বস্তরের মানুষের শিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগলাভ। নতুবা, সমাজে নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ অনিবার্য। তিনি দেখেছেন এই দ্বন্দ্ব ইউরোপ ও আমেরিকায়। ভারতবর্ষে এর সূচনা লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন—''বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম। তোরা এই কার্যে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে, দেশে দেশে এই অভয়বাণী আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে শোনা গে।''

দেশের সহস্র সহস্র দরিদ্র লোক যে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমগ্ন তাদের শিক্ষিত করবে কে? একথা আমরা ভুলে যাই। স্বামীজী বলেছেন, 'যতদিন পর্যন্ত কোটি কোটি মানব অনাহারে ও অজ্ঞতায় অন্ধকারে জীবনযাপন করিবে, ততদিন দেশের প্রত্যেক লোককে আমি বিশ্বাসঘাতক বলিব। কারণ, এজন্য তাহারাই দায়ী। তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে শিক্ষিত হইয়া লোকে তাহাদের প্রতি উদাসীন থাকে।'

আমরা যে কতখানি উদাসীন তা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে উপলব্ধি করতে হয়, যখন দেখা যায় পৃথিবীর ১১০ কোটি অশিক্ষিতের অর্ধেকের বেশি বহন করছি আমরা। সংবাদপত্রের পাতা ওলটালে চোখে পড়ে 'হরিজনদের উপর অত্যাচার'। ---সুতরাং এই কোটি কোটি অশিক্ষিত মানুষকে শিক্ষাদানের সংকল্প গ্রহণ করতে হবে প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তিকে। এই পবিত্র ব্রতকে আমরা যদি গ্রহণ না করি তাহলে স্বামীজীর ভাষায় দেশের কাছে, জাতির কাছে আমরা বিশ্বাসঘাতক।

''আমিই সেই পরমাত্মা, আমাকে অস্ত্র খণ্ডিত করিতে পারে না; অসি আমাকে বিদ্ধ করিতে পারে না; অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু আমাকে শুষ্ক করিতে পারে না। আমি সর্বশক্তিমান।'' —এই অমোঘ মন্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে জনকল্যাণ সাধনে ব্রতী হতে হবে প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তিকে। তবেই, স্বামীজীর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হবে।

শিক্ষার আর এক নাম জীবন। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে, এক সুরে। সেটা ক্লাস নামধারী খাঁচার জিনিস হবে না।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়ে ঠিক এর বিপরীতটাই দেখেছিলেন ইংরেজ তৈরি বিদ্যালয়ের কারাগারে যেখানে পুঁথিগত বিদ্যা সংগ্রহ করা হয় মাত্র, প্রকৃত শিক্ষা যা আচরণীয় তার সঙ্গে সে বিদ্যার লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। বিদেশের কলে তৈরি এই শিক্ষার সঙ্গে স্বদেশ ও দেশবাসীর আত্মার কোনো যোগ নেই, ফলে তথাকথিত শিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিতের ব্যবধান অনিবার্য হয়ে ওঠে। আয়ারল্যান্ড ও ভারতবর্ষ এই দুই দেশেরই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শিক্ষাজনিত দুর্ভাগ্যের শিকার যারা তাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

''দেশের ইতিহাস ও ভূবৃত্তান্ত শিখিয়া নিজের দেশ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিত। ইহার ফল যেমন হওয়া উচিত, তাহাই হইল। মানসিক জড়তা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া গেল, আইরিশভাবী ছেলেরা বুদ্ধি ও জিজ্ঞাসা লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল, বাহির হইল পণ্ড মন এবং জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা লইয়া। ইহার কারণ এই শিক্ষা প্রণালী, ইহাতে মন খাটে না, ছেলেরা তোতাপাখি বনিয়া যায়।''

অবশ্য ছেলেদের তোতাপাখি না বনে গিয়ে উপায় নেই, একে তো কলে তৈরি ছাঁচে ঢালা শিক্ষা, তার উপর ভাষাও বিজাতীয়, মাতৃভাষা বাদ দিয়ে বিদেশি ভাষায় যে কোনো শিক্ষাই দুরূহ। যেমন আমাদের দেশে ইংরেজির ভার চাপিয়ে অযথা শিক্ষাকে দুর্বহ করে তোলা হয়েছে। 'বাংলার সঙ্গে ইংরেজির শব্দবিন্যাস বা পদবিন্যাসের কোনো যোগ নেই, এমনকী অনেকক্ষেত্রে ভাব, প্রসঙ্গ বা বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কও অনেক দূরের। কাজেই ধারণা হওয়ার আগেই মুখস্থ ছাড়া উপায় নেই।

ইংরেজি শেখার এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় আমাদের ছাত্র

জীবনের অভিজ্ঞতা বেশ করুণ। স্কুলে, কলেজে, 'Poor' এই বিশেষণটি শুনতে শুনতে সত্যি নিজের মধ্যে এক দীনতা এসে গিয়েছে যে, আজও তা কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য বিধানই যদি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়, তবে সেই মিলন ঘটাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। আর তার আকাঙ্ক্ষিত পূর্ণতা এনে দেবে শিক্ষার জাতীয় রূপ। যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 'জীর্ণচীরধারিণী' ভারতমাতার দাসত্বমোচনের স্বপ্ন দেখে অসহযোগ আন্দোলনের সময় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আশার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন—

''জগতের মধ্যে ভারতবাসীর যে একটি বিশেষ অধিকার আছে সেই অধিকারের জন্য আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় আমাদিগকে প্রস্তুত করিবে, আজ এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া আমরা নূতন ভবনের মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলাম।''

এই ভাবেই আরও আশা প্রকাশ করেছিলেন। আশুতোষ মুখার্জীর প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলাভাষা শিক্ষার' জন্য 'একটুখানি হাতল জুড়িয়া দেওয়ার' জন্য। শিক্ষার উপযুক্ত বাহন হিসেবে জাতীয় মুক্তির প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষা প্রসঙ্গটি বেশ বিতর্ক ও যুক্তি সহকারে আলোচনা করে জোরের সঙ্গেই মাতৃভাষার পক্ষ অবলম্বন করে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে কি নানা প্রকারের সুবিধা হয় না? একে তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।''

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে শিক্ষা বিস্তারের নানারকম উপায়ের কথা ভাবা হচ্ছে। 'বাংলা ভাষায় উচ্চগ্রন্থ নাই' এই যুক্তিতে আজও আমরা বিদেশিভাষার মোহ থেকে মুক্ত হতে পারিনি। আরও একটি কারণ, শিক্ষা জীবনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশসুদ্ধ সকলকে চাকুরে মানুষ তৈরি করার ঝোঁকে শিক্ষার নামে প্রহসন রচনা করা হচ্ছে। আমরা দলে দলে 'ডাক্তার', 'ইঞ্জিনিয়ার' হওয়ার প্রতিযোগিতায় নামছি, আর যারা হতে পারছি না, তারাই হয়ে উঠছি আত্মঘাতী। স্কুল, কলেজে, শাসনব্যবস্থা, আইন সব কিছু ভেঙে তছনছ করে দিয়ে ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিচ্ছি। শিক্ষিতের সঙ্গে শিক্ষার আশ্রয়ের কোনো মমত্ব গড়ে উঠছে না। তার কারণ আমরা যারা শিক্ষা দিই, তারাও স্কুল, কলেজ 'চাকরি' করি মাত্র। আর যাদের দিই তারাও তা মূল্য দিয়ে কেনে এইমাত্র। প্রযুক্তিবিজ্ঞান শাসিত সমাজের এই বিচ্ছিন্নতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে ফিরে তাকাতে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের দিকে অথবা প্রাচীন ভারতের তপোবনাশ্রিত-জীবনাদর্শের দিকে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু চিন্তানায়ক মাত্র নন, তিনি শিক্ষার কারিগরও। জাতীয় প্রণালীতে শিক্ষার রূপ দিতে গিয়ে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের কথা ভেবেছেন—

''এদেশে একদিন তপোবনের এইরূপ ব্যবহারই ছিল যেখানে সাধনা ও শিক্ষা একত্র মিলিত হইয়াছিল বলিয়া সেখানে পাওয়া ও দেওয়ার কাজ অতি সহজে নিয়ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তপোবন হৃৎপিণ্ডের মতো সমস্ত সমাজের মর্মস্থান অধিকার করিয়া তাহার প্রাণকে শোধন, পরিচালন এবং রক্ষা করিয়াছে। বৌদ্ধ বিহারেও সেই কাজ ছিল সেখানে পাওয়া ও দেওয়া অবিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছিল।''

প্রকৃতির প্রাঙ্গণে গুরু-শিষ্যের সহযোগিতায় শিক্ষা হয়ে উঠেছিল জীবনের সহচর। প্রাণের স্পর্শে, আত্মার সম্পর্কে হয়ে উঠেছিল সজীব। শান্তিনিকেতনের পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ এমনই এক আশ্রমকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন প্রকৃতির একেবারে কোলের কাছে বসে। সেখানে শিক্ষার্থীর সাধনা শুধুমাত্র 'তপস্বীর' নয়, নাচে-গানে, ছবিতে জীবনের অন্যদিকগুলি ভরে উঠেছিল। এই আনন্দের আয়োজনে সেকালের আশ্রম-আবাসিকরা নীরস পাঠ্যবিধির বাইরেও জীবনের উদ্বৃত্তকে খুঁজে পেয়েছিলেন। বর্তমানে শুধুমাত্র ডিগ্রির প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তকের ভারে পীড়িত ছাত্র-ছাত্রীরা অধিকাংশই সেই সরসতার থেকে বঞ্চিত, জীবিকার নৈরাশ্যে জীবনের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন। শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকুরিশালা থেকে জীবনের কোনো উপাদান তারা খুঁজে পায় না বলেই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তারা তাদের অনাস্থা সোচ্চারে ঘোষণা করে, কখনো কখনো কাজেও তা প্রমাণ করে। উদাহরণ হিসেবে ১৯৭৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর সংবাদপত্রেই পাশাপাশি প্রকাশিত দুটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যায়। একটি— 'শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে, অন্যটি— 'মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের কলিকাতা বিশ্ববিদালয়ের উপাচার্য ও সিনেট সদস্যদের ঘেরাও-এর কারণে উনিশজন আহত, পঁচিশজন ধৃত' —রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীরা আসেন, সমাধানের সূত্রগুলিও দিয়ে যান, কিন্তু এ আঁধারের শেষ কোথায়?

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার জাতীয় মুক্তির কারণে তপোবন আশ্রমের সঙ্গেই 'পূর্ব-পশ্চিমের শিক্ষার মিলনের কথা বলছেন। সত্যলাভের সাধনায় আত্মিক শিক্ষার সঙ্গে বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষার সমন্বয়ে কবি স্বয়ং 'বিদ্যাসমবায়' নীতির সমর্থক জীবনের উপযোগী শিক্ষার কাঠামো রচনা করেন। শান্তিনিকেতনকে 'বিশ্বভারতী' করে তোলার প্রচেষ্টায় কবি যেমনভাবে আজীবন শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করেছিলেন তেমনই ভারতবর্ষে 'বিশ্ববিদ্যালয়' যথার্থভাবেই 'অতিথিশালা' হয়ে উঠুক এইরকম একটি অন্তরের কামনা নিয়েই শিক্ষা সম্পর্কে শেষ কথা উচ্চারণ করেছেন— 'যার সম্পদ উদ্বৃত্ত আছে সেই ডাকে অতিথিকে গৃহস্থ আপন অতিথিশালায় বিশ্বকে স্বীকার করে। নালন্দায় ভারত আপন জ্ঞানের অন্নসত্র খুলেছিল স্বদেশ-বিদেশের সকল অভ্যাগতদের জন্য।

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। নিজের ঘরের নিজের দেশের মধ্যে যে মুক্তি তা হলো ছোটো কথা : তাতে করে সত্য খণ্ডিত হয়, আর সেইজন্যই অশান্তির সৃষ্টি হয়। অন্যেরা যে কাজেরই ভার নিন না, 'বণিক বাণিজ্য বিস্তার করুন, ধনী ধন সঞ্চয় করুন, কিন্তু এখানে সর্বমানবে যোগসাধনের সেতু রচিত হবে।' □

সাধুসন্তদের ওপর আক্রমণ প্রমাণ করল রাজ্য সরকার হিন্দু বিদ্বেষী

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সে অনেক বছর আগেকার কথা। বাদশা আকবরের সময়ের একটি ঘটনা। মুসলমান ফকিররা যত্রতত্র হিন্দু সন্ন্যাসীদের হত্যা করছে। সেসময় বিখ্যাত সাধক ও পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী যমুনার তীরে অবস্থান করছেন। বাদশা আকবর এবং তাঁর সেনাপতি টোডরমল তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করেন। সাধুরা কয়েকজন মিলে সরস্বতীকে বললেন— 'কিছু একটা করুন। আমরা বড়োই বিপন্ন। বাদশাকে আমাদের অসহায়ত্বের কথা বলুন।' সাধুদের কথা শুনে মধুসূদন বাদশাকে সবকথা খুলে বললেন। মধুসূদনের কাছে সবকথা শুনে বাদশা বললেন— 'আমি ফরমান জারি করতে পারব না; কারণ ধর্ম। তবে একটা পথ বলে দিতে পারি। তা হলো, আপনি সাধুদের বলে দিন, ফকিররা একটা সাধু মারলে সন্ন্যাসীরা দশটা ফকির মারবেন।' হলোও তাই। সব ঠাণ্ডা। সুকুমার রায়ের ছড়ার সেই লাইন, 'তেড়ে মেরে ডান্ডা করে দেব ঠান্ডা' —দাওয়াই আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন।

অনেকে প্রকাশ্যে বলছেন, দীর্ঘ কয়েকশো বছর পরে খণ্ডিত ভারতের এক অঙ্গরাজ্যে ইসলামি শাসন প্রবর্তন হয়েছে আধুনিক যুগের ২০১১ সাল থেকে, এক হিন্দু বিদ্বেষী শাসকের আমলে। সেই শাসকের অঙ্গুলিহেলনে জেহাদিরা অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহরে হিন্দুদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, কিছুদিন থেকে তারা আক্রমণ নামিয়ে এনেছে হিন্দু সমাজের পরমপূজ্য সর্ব ত্যাগী সন্ন্যাসীদের ওপর এবং তাঁদের আশ্রম, মঠ, মন্দিরের ওপর।

কয়েকদিন আগে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির ঢিল ছোড়া দূরত্বে তপোবনতুল্য শ্রীশ্রী ভোলাগিরি আশ্রমে সন্ন্যাসীদের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ এবং চোর-ডাকাত বলে অপমানের ঘটনায় প্রতিবাদ মুখর হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গের সাধু সমাজ। এই হামলার প্রতিবাদে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজের নেতৃত্বে মঠ ও মিশনের কয়েকশো সাধুসন্তরা কলকাতা উত্তাল করে তুলেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন— 'মনীষীদের পশ্চিমবঙ্গে সাধুরা কেন অপমানিত? ভারতবর্ষ সাধু-সন্ন্যাসীদের দেশ। এই রাজ্যের মাটি থেকেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের মতো মনীষীরা বিশ্বজয়ের ডাক দিয়েছিলেন। আজ সেই রাজ্যের বুকেই প্রাচীন আশ্রমের সন্ন্যাসীদের চোর-ডাকাত বলে অপমান করা হচ্ছে কী করে? এটি কেবল একটি আশ্রমের অবমাননা নয়, এটি গোটা ভারতবর্ষের সাধু সমাজের অপমান। কেন বারবার হিন্দু সন্ন্যাসীদের টার্গেট করা হচ্ছে?' তিনি আরও বলেন, 'এই প্রতিবাদ কেবল কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ন্যায়বিচার না মিললে এই বিক্ষোভের আগুন গোটা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। যদি সাধুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা হয় এবং অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা চলে, তবে সারা ভারতের সাধু সমাজ একজোট হয়ে আন্দোলনে নামবে।'

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে যে— তৃণমূলের এক নেতৃত্বের নির্দেশে ভোলাগিরি আশ্রমের গেরুয়া বসনধারী সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের শারীরিক নিগ্রহ, কুরুচিকর গালিগালাজ এবং মন্দিরের বিদ্যুৎ ও জল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার মতো জঘন্য ঘটনা ঘটানো হয়েছে। আর এই সাধু নিগ্রহের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন— 'পশ্চিমবঙ্গে সন্ন্যাসীদের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি আর কতদিন চলবে? এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমাদের সন্ত সমাজের দাবি, পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানোর যে গভীর চক্রান্ত চলছে, এটি তারই একটি অংশ।'

শাসকদলের বিরুদ্ধে সরাসরি মুসলমান তোষণ এবং হিন্দুদের অস্তিত্ব বিলীন করার অভিযোগ তুলে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং ইসকনের মতো বিশ্বখ্যাত হিন্দু

ধর্মীয় সংগঠনের বিরুদ্ধের প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে কুৎসা ছড়ানো হচ্ছে। গীতার মন্ত্রে ঘর ছেড়ে পথে নামেন সাধুরা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই সনাতন ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টায় এখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে সাধুসন্তদের।

এদিনের ঘটনায় বঙ্গীয় সন্ত সমাজের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে— 'শ্রীরামনবমীতে পাথর বৃষ্টি, দুর্গামণ্ডপে গোমাংস নিক্ষেপ এবং হরিনাম সংকীর্তনে বাধা দেওয়ার মতো ঘটনাগুলো আর মুখ বুজে সহ্য করা হবে না।' জেহাদি সন্ত্রাসমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়ার লক্ষ্যে এবং হিন্দু নিধনের অপচেষ্টা রুখতে পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে গীতার বাণী পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছেন তাঁরা। তারই প্রেক্ষিতে মহাশক্তি প্রদর্শনের জন্যই তাঁরা কলকাতার রাজপথে নেমেছেন।

সাধুসন্তদের নিগ্রহের প্রতিবাদে এবং সনাতন ধর্ম জাগরণ ঘটাতে গত ২০ এপ্রিল দু'টো থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বালিগঞ্জ থেকে হাজরা মোড় হয়ে ভবানীপুর ভোলাগিরি আশ্রম পর্যন্ত সন্ত স্বাভিমান ও হিন্দু জাগরণ যাত্রার জন্য পদযাত্রা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই পদযাত্রায় দশনামী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মঠ, মিশন ও আশ্রমের সাধু ও নাগা সাধুরাও অংশ নিয়েছেন। বঙ্গীয় সন্ত সমাজের হুঁশিয়ারি— 'সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ঘুমিয়ে থেকো না, জাগো! ভবিষ্যতের জন্য সনাতন ধর্মের স্বাক্ষর রেখে যাও।'

শুধু এবারেই নয়, এর আগেও দেখা গিয়েছে রাজ্যের পুরুলিয়া জেলার কাশীপুরে সাধুদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটতে। সেখানে উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত তিনজন সাধুকে বিনা অপরাধে চড়, কিল, ঘুষি মারা এবং চুল ধরে টানাটানি-সহ অকথ্য গালাগালিও করেছে সিভিক পুলিশ তকমাধারী এক জেহাদি। তার আগে মহারাষ্ট্রের পালঘরে দু'জন সন্ন্যাসীকে জেহাদিরা হত্যা করেছে। তারও আগে ১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল কলকাতার কসবার বিজন সেতুর ওপর বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর শাসনে আনন্দমার্গের ১৭ জন সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীকে লাঠি বড়ো দিয়ে পিটিয়ে তাদের গায়ে কেরোসিন পেট্রল ঢেলে মধ্যযুগীয় কায়দায় তাঁদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। এছাড়া আক্রান্ত হয়েও চিকিৎসার কারণে প্রাণে বেঁচে ছিলেন ১৮ জন। এসব জেনে অনেকেই বলছেন, দেশের যে সমস্ত রাজ্যে বিজেপি বিরোধী দল শাসন ক্ষমতায় রয়েছে, সেখানে বিজেপির বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা সমগ্র হিন্দু সমাজ এবং হিন্দু সন্ন্যাসীদের ওপর আক্রমণ হানতে দ্বিধা করছে না।

এতকিছু ঘটনা ঘটার পরেও রাজ্যের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ, উদার, বুদ্ধিজীবী, প্রগতিশীল, কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, সাংবাদিক প্রভৃতি মঞ্চ কাঁপানো রথী-মহারথীরা চুপ করে রয়েছেন। পুরুলিয়ার ঘটনার পরেও তাঁরা চুপ ছিলেন। এবারের ঘটনার পর তাঁদের মতো মহান মহান মনীষীদের মুখনিঃসৃত বাণী শুনে নিজেকে লুকানোর জায়গা থাকে না। এই রাজ্যের জেহাদিরা জনগণের অর্থে নিরাপত্তা পেলেও সন্ন্যাসীরা নিরাপত্তা পান না কেন? যে বা যারা ভোলাগিরি আশ্রমের সাধুদের ওপর অত্যাচার করল তাদের শাস্তির দাবিতে ফুঁসছে আপামর বঙ্গবাসী।

শুধু কি জেহাদিরাই সন্ন্যাসীদের ওপর হামলা করেছে, তা তো নয়? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বহুবার হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের ওপর মৌখিক আক্রমণ করেছেন। তিনি আক্রমণ করেছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজকে, ইসকন এবং রামকৃষ্ণ মিশনকেও। একবার তিনি ইসকনকে নিয়ে মিথ্যা রটনা ছড়াতেও দ্বিধা করেননি। তিনি এক সভামঞ্চ থেকে বলেছিলেন— 'আমি ইসকনকে ৭০০ বিঘা জমি বিনামূল্যে দিয়েছি।' তাঁর এই বক্তব্যের পরের দিনই ইসকনের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিনিধি ঘোষণা করলেন— 'গতকাল মুখ্যমন্ত্রী ইসকনকে জমি দেওয়ার যে ঘোষণা করেছেন তা সত্য নয়। আমরা মূল্য দিয়েই জমি কিনেছি। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগিতায় ওই জমির রেজিস্ট্রি খরচ ইসকনকে বহন করতে হয়নি।' তাহলে ভাবুন একবার!

এরাজ্যের হিন্দুদের বাঁচতে হলে, শিক্ষা-সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হলে, হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ ভুলে গিয়ে এক মন্ত্র গ্রহণ করতে হবে— 'আমরা হিন্দু।' নচেৎ একবার যাঁরা বা যাঁদের পিতা-পিতামহ তাঁদের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে কোনোরকমে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ সৃষ্ট এই পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন, তাদের এবং অবশিষ্ট বাঙ্গালিকে এরাজ্য থেকে পুনরায় পালাতে হবে। কিন্তু পালিয়ে যাবেন কোথায়? সেটা ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। মনে রাখতে হবে, কাশ্মীর থেকে সেখানকার ভূমিপুত্র পণ্ডিতদের পালাতে হয়েছে। এরাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের হিন্দুদের পালিয়ে শহরে আসতে হচ্ছে। মুর্শিদাবাদের হিন্দুদের পালিয়ে মালদহে আসতে হচ্ছে। আবার মালদহের মোথাবাড়ির হিন্দুদেরও কিছুদিনের জন্য পালাতে হয়েছিল। এসব ঘটনা নিয়ে অন্তত কিছু সময়ের জন্য হিন্দুদের ভাবতে হবে। নচেৎ পরবর্তী প্রজন্ম ক্ষমা করবে না। □

বাংলাভাষার ধ্রুপদী সম্মান

গত ২০২৪-এর অক্টোবর মাসে বাংলাভাষা ধ্রুপদী সম্মান পেয়েছে আরও চারটি ভাষা অসমীয়, মরাঠি,পালি ও প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে। কোনো ভাষাকে ধ্রুপদী সম্মান পেতে হলে সেই ভাষা অবশ্যই প্রাচীন মানে ১৫০০ থেকে ২০০০ বছর পুরোনো হতে হবে। দ্বিতীয়ত, সেই ভাষা সমৃদ্ধ হতে হবে এবং অবশ্যই সেই ভাষার ধারাবাহিকতা বহমান থাকতে হবে ইত্যাদি। এমনটা হলে সে ভাষা ধ্রুপদী সম্মান পাওয়ার যোগ্য হয়। বাংলাভাষা দুই হাজারেরও বেশি প্রাচীন এবং বাঙ্গালির ঐতিহ্য পাঁচ হাজার বছরের পুরনো। দেবভাষা সংস্কৃত থেকে যে বাংলাভাষার উৎপত্তি— সুকৌশলে সেই ইতিহাস চেপে যাওয়ার মাধ্যমে বহু দশক ধরে বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সপ্তডিঙা' পত্রিকায় বলা হয়েছে--- 'চর্যাপদকে বাংলাভাষার ঐতিহ্য রক্ষার মূল অস্ত্র বলে অভিহিত করা হয় যদিও কিন্তু বাংলা সাহিত্যের যুক্তিজালে ধরা পড়ে 'নাথ সাহিত্য', শূন্যপুরাণ, গোরক্ষ বিজয়, বিভিন্ন দোহাকোষ, পঞ্জিকা ভঙ্গিকা গোত্রের গ্রন্থ, ডাকার্ণব, ময়নামতীর গান, ডাক ও খনার বচন ইত্যাদি। এই নিদর্শনগুলির অস্তিত্ব আজ বাঙ্গালির হাতেই বিপন্ন। চর্চাপদ বা জয়দেব হাতছাড়া হলেও এখনো পড়ে রয়েছে অসংখ্য সাহিত্যিক নিদর্শন হয়তো গ্রন্থাগারের আলমারিতে লাল শালুতে মোড়া অবস্থায়, সেই লাল শালুর বাঁধন কেটে বের করেই ঘটবে বাংলাভাষার উত্তরণ।'

আরও শর্ত হচ্ছে সেই ভাষার তথ্য সমৃদ্ধ দলিল মানে সেই ভাষার ঐতিহাসিক নিদর্শন, পুস্তক, লিপি, মুদ্রা ইত্যাদির উপর বই তৈরি করে ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরে পাঠাতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার দ্বারা। এরপর সংস্কৃতি দপ্তরের একটি বিশেষজ্ঞ সমিতি দ্বারা রাজ্য সরকারের পাঠানো তথ্য সমুহ পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেই ভাষা ধ্রুপদী সম্মানের যোগ্য কিনা তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানায় এবং তারপর ভারত সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার পর সেই ভাষাকে ধ্রুপদী সম্মানের মর্যাদা দিয়ে থাকে। উল্লেখ্য, জানুয়ারি ২০২৪ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে বাংলা ভাষার উপর ২২০০ পৃষ্ঠার চারটি খণ্ডে ইংরেজীতে তথ্য সমৃদ্ধ দলিল ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরে পাঠানো হয় এবং পরবর্তীতে বাংলাভাষা ৪ অক্টোবর থেকে ধ্রুপদী সম্মান পায়। কোনো ভাষা ধ্রুপদী সম্মান পেলে সেই ভাষার উপর চেয়ার সৃষ্টি হয় ভারতের ২৮টি রাজ্যে-স্থিত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এবং প্রতিটি ধ্রুপদী সম্মান প্রাপ্ত ভাষা নিয়ে গবেষণা হয়, থাকে পুরস্কার ইত্যাদি। এযাবৎ ভারতের এগারোটা ভাষা ধ্রুপদী সম্মান পেয়েছে।

২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ছয়টি ভাষা তামিল, তেলুগু, কানাড়ি, মালয়ালম, সংস্কৃত ও ওড়িয়া ভাষা। এই সমস্ত ভাষার ভারতের ২৮টি রাজ্যেস্থিত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চেয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং সেখানে যথারীতি পড়াশোনা হচ্ছে। যতদূর জানা গিয়েছে যে, গতবছর ধ্রুপদী সম্মান পাওয়া বাংলা ভাষার উপর চেয়ার এখনও সেই অর্থে সৃষ্টি হয়নি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ভীষণ পরিতাপের। তথ্য জানার অধিকার আইনে আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতির তরফে আবেদন করে জানা গেছে যে, সত্যিই চেয়ার সৃষ্টি হয়নি এখনো। এমনটা মেনে নেওয়া যায় না। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের বোলপুরস্থিত শান্তিনিকেতন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিগণিত যা কবিগুরুর সৃষ্টি। অনেকের মতো আমরাও অপেক্ষা করছি যে কবে ভারতের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্রুপদী সম্মান প্রাপ্ত বাংলা ভাষার উপর চেয়ার সৃষ্টি হবে। আশাকরি, শীঘ্রই ভারত সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে ধ্রুপদী সম্মান প্রাপ্ত সব ভাষার উপর চেয়ার সৃষ্টি হয়। সবশেষে বলি, পৃথিবীর মিষ্টতম তথা ধ্রুপদী সম্মান পাওয়া ভাষা বাংলার প্রতিজন বাংলা ভাষা প্রেমী দায়বদ্ধ হই বেশি করে যাতে ভাষা-বলিদানীদের আত্মাহুতির যোগ্য মর্যাদা দিতে পারি দেরিতে হলেও।

—সজল কুমার গুহ,
ইন্দিরাপল্লী, শিলিগুড়ি।

রক্তপাতহীন নির্বাচন চাই

নির্বাচন কমিশন জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ— সুস্থ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ, সুন্দর নির্বাচন যাকে বলে। দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রী, নেতা, নেত্রী পার্টির দালাল, হার্মাদ বাহিনী, জল্লাদ বাহিনী, দলদাস পুলিশ থেকে আমলা, হার্মাদ সবাই নির্বাচন থেকে এখন দূরে অবস্থান করছে। বাঘ-হরিণ এখন এক ঘাটে জল খাচ্ছে। আইপ্যাকের কাজকর্ম বন্ধ। আইপ্যাকের সহ কর্ণধার দিনেশ চ্যাণ্ডেল এখন দশ দিনের ইডির জেল হেফাজতে। মদের দোকান বন্ধ। বাইক বাহিনীর দাপট বন্ধ। আটশো জন দাগি আসামি এখন জেলের অন্ধকারে রাত্রিবাস করছে। সিআরপিএফ এখন সর্বত্র, সর্বদা সজাগ যে কোনো অপ্রীতিকর কাজকর্ম রুখে দিতে তারা তৎপর। এসআইআর নিয়ে যে চরম উত্তেজনা এখন ক্রমশ শান্ত হচ্ছে। এসআইআর নিয়ে ট্রাইবুনালে বিচারাধীন। এবার প্রায় তিরানব্বই লক্ষ ভোটার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। অবৈধ ভোটার বাতিল হয়েছে। বৈধ ভোটারের ভোট দানের মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছ নির্বাচন উপহার দেবে। নির্বাচন কমিশন আলোক বর্তিকা হয়ে পথ দেখাচ্ছে। ভয়, সন্ত্রাসহীন পরিবেশ চাই যেখানে গণতন্ত্রের মুক্ত বিচরণ আছে। আমাদের দেশে ভোট মানে জনগণের টাকায় নির্বাচনী মহোৎসব হয় যা কখনো কাম্য নয়। তাই এক দেশ, এক নির্বাচন চাই। কেউ ভয়, হুমকি কিংবা ভোট ম্যানেজ করতে চাইলে নির্বাচন কমিশনের টোল ফ্রি নম্বর দেওয়া হয়েছে। ওই ফোন নং ১৮০০৩৪৫০০০৮ যোগাযোগ করে তাদের বক্তব্য জানাতে পারে। রক্তপাতহীন নির্বাচন চাই। প্রথম দফার ভোট সম্পন্ন হলো ২৩ এপ্রিল ২০২৬,

তাতে ১৫২ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে।

এখানে নেতা-নেত্রীদের সহজে কেনা যায়, তারা সহজে বিক্রিও হয়। ঘোড়া কেনা-বেচার মতো তাদেরকে নিলামে চড়ানো যায়। আদর্শ নীতি নয়, দুর্নীতিই আদর্শ হয়ে ওঠে। এই নির্বাচনে ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া প্রধান হয়ে ওঠে যেখানে উন্নয়ন গৌণ থাকে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বনাম অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার ১৫০০ টাকা বনাম ৩০০০ টাকা মহিলাদের জন্যে ঘোষণা করেছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৩০০০ টাকা, তৃণমূল জিতলে ১৫০০ টাকা। নারী সুরক্ষা, নারীর সম্মানহানি করে তৃণমূল সরকার নারী মন জয়ের চাবিকাঠি খোঁজার চেষ্টা করছে। শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য, চাকরি কিছুই নেই, এই সরকারের পুঁজি কেবল ধোঁকা দেওয়া। এই নির্বাচনের পর যেই সরকার আসুক তার মাথায় উপর কয়েক লক্ষ হাজার কোটি টাকার ঋণ চাপবে। সিপিএম থেকে তৃণমূলের জমানায় সেই ঋণ লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই উন্নয়নের সঙ্গে সন্ত্রাসমুক্ত সরকার এবং ঋণমুক্ত সরকার চাই। নারী সুরক্ষা চাই-ই, চাই, অভয়ারা যেখানে নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারে।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

মহাবৈশাখ

'কহিতে বাঙ্গলা সন মনে বিমর্ষিয়া।
দধিসূত শেষে যুগ চন্দ্রে চন্দ্র দিয়া।'

বিশ্বকোষ অষ্টাদশ ভাগে উল্লিখিত কাব্য সমাপ্তিতে যে চারটি অব্দের কথা যা কাব্য লেখার শেষ দিনে চলছে তা বলা হয়েছে। সেখানে দেখা যায় ৯১১ হিজরি, ১০৪ ইউছুপশাহি, ৯১১ বাংলাসন ও ৮৬৭ মঘীসন একই সঙ্গে চলছে। অর্থাৎ ৯১১ হিজরি ও ৯১১ বঙ্গাব্দ একই সঙ্গে থাকায় যারা বলে 'বঙ্গাব্দ' বাদশা আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত, তাদের ভরাডুবি হয়। আসলে হেঁয়ালিগুলির অর্থ বিশ্বকোষে দেওয়া না থাকায় বিপত্তি ঘটেছে। হেঁয়ালি চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমে হিজরি, তারপরে ইউসুপশাহি সন এবং তার পরেই 'কহিতে বাঙ্গলা সন।' এখানে দধিসূত হচ্ছে রামায়ণে কথিত দধিমুখের ছেলে কাঠবিড়ালি অর্থাৎ নয় সংখ্যা কাঠবিড়ালি বসলে ৯-এর মতোই দেখায়। এই নয় সংখ্যার পরে একেচন্দ্র একেচন্দ্র বসালেই ৯১১ বাংলা সন পাওয়া যায়। শেষ হেঁয়ালিতে 'চন্দ্রা' অর্থে আটচালা, 'নিত' অর্থে সমুদ্র। তাই, 'চন্দ্রাপারে চন্দ্র ঋতু পৃষ্ঠে তার নিত' বলতে ৮৬৭ মঘী সন। এই ৮৬৭ মঘীসনে ৯১১ বাংলা সন চলছে।

আসলে মহাবৈশাখ তথা ১লা বৈশাখেই নববর্ষের পত্তন হয় গুপ্ত যুগে। এটা গুপ্তাব্দের নববর্ষ উৎসব যা ইংরেজি ৩২০ বর্ষে প্রথম শুরু হয়। কিন্তু বঙ্গাব্দের অব্দ সংখ্যাটি হচ্ছে শশাঙ্ক সম্বতের সংখ্যা যা ইংরেজি ৫৯৪ সালে শুরু হয়। মেদিনীপুরে প্রাপ্ত পাট্টায় শশাঙ্ক সম্বতের উল্লেখ আছে। মহারাজ শশাঙ্ক নিজ নামে অব্দের প্রচলন করলেও মহাবৈশাখ যথাপূর্বংতথাপরং রয়েই যায়। শশাঙ্ক সম্বৎ ছিল চান্দ্রমানে গণিত বছর। ইং ৬৬৫ কিংবা ৬৬৬ সাল নাগাদ চান্দ্রমান ছেড়ে দিয়ে সৌরমানে বর্ষগণনা শুরু হয় এবং শশাঙ্ক সম্বতের পরিবর্তে কেবল 'সন' শব্দটির ব্যবহার আরম্ভ হয়। এবং চান্দ্রমাসের নাম হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়। তবে, ওই কাব্য সমাপ্তিতে এবং ঈশা খাঁ গাজদানীর কামানে বাংলা সনের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাস্তবে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের তাতভ্রাতা চাঁদ রায়ের দানপত্রে 'বাংলা সন' লিখিত থাকলেও বর্তমান ফরিদপুর জেলার সীতারাম রাজা ও তস্যপুত্রের দানপত্রে বঙ্গাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এর আগে বঙ্গাব্দ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এটাই বঙ্গাব্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সবিস্তার নয়।

সিদ্ধান্ত, মহাবৈশাখ তথা ১লা বৈশাখে নববর্ষের জন্ম গুপ্ত রাজধানী কুসুমগ্রাম তথা পুষ্পনগর তথা পাটলীপুত্র তথা পাটনায়; আগ্রাতে নয়। এবং বঙ্গাব্দ শব্দটি জন্মেছে ফরিদপুর জেলার মহম্মদপুরে। কর্ণসুবর্ণে জন্মেছে শশাঙ্ক সম্বৎ। কামরূপের ভাস্কর বর্মা ছিলেন শশাঙ্কের অধীনে করদ রাজা। তাই, ভাস্করাব্দ আসলে বঙ্গাব্দ-ই। সেটা স্বতন্ত্র কোনো অব্দ নয়। 'বাংলাসন' কথাটির জন্ম সঠিক বলতে পারবো না। তবে, এই কথাটির জন্ম বরিশালের কোথাও হতে পারে বলেই অনুমান। মনে রাখতে হবে, আকবরি বাংলা মুদ্রায় হিজরি সন লেখা রয়েছে, বাংলা সন লেখা নেই। 'হাল' শব্দের বহু অর্থ। হালখাতা বলতে নতুন খাতা। এটা গুপ্তযুগের রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়। এই দিনে গণেশ (সূর্য) ও লক্ষ্মী (সম্পদ) পূজার চলন দেখা যায়। এই দিনে ঘৃতের প্রদীপ ও শুদ্ধ আচারে দেবালয়গুলিতে অর্চনা হয়। তবে, আকবরের তারিখ-ই- ইলাহির নববর্ষ ও হিজরি সালের নববর্ষ একই সঙ্গে পয়লা মহরমের সন্ধ্যাবেলায় পালন করা হতো। মনে রাখতে হবে, হিন্দুদের বার শুরু হয় ঊষাতে কিন্তু মোল্লাদের বার শুরু হয় গোধূলিতেই। এছাড়া, আকবরের দেওয়ান টোডরমল্লের জাবদা খাতায় বঙ্গাব্দের উল্লেখ নেই। আকবর জীবদ্দশায় সমগ্র বৃহৎ বঙ্গ দখলই করতে পারেননি। যারা আকবরকে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক বলে তারা গর্দভ শাবক ছাড়া কী? ৯১১ বাংলা সনে আকবরের পিতা হুমায়ুনের জন্ম হয়েছিল তো? এই প্রশ্নের উত্তর আকবরপন্থীদের কাছে আছে কি?

—মৃণাল হোড়,
চন্দননগর, হুগলী।

মহিলা সংরক্ষণ বিলের বিরোধিতা কেন

বিরোধীরা যদি দাবি করতেন মহিলা বিল পাশ হওয়ার আগে রাজনীতিতে Jointentrance/CAT টাইপের Exam চালু হোক, তাহলে তাদের ধিক্কার না দিয়ে ধন্যবাদ জানাতাম। যোগ্য পুরুষ, মহিলারা রাজনীতিতে আসুন। ভারতে জনপ্রতিনিধি যেমন এমপি, এমএলএ হতে টিপ সই দিতে পারলেই হয়। শিক্ষিত মানুষেরা রাজনীতিতে আসেন না দুর্বৃত্তদের ভয়ে। বিএ,এমএ পাশ করলেই কি রাজনীতিবিদ হওয়া যায়? ডিলিমিটেশন বিল আগেও এসেছিল, পরেও আসবে। সরকার বিল আনুক, যাদের জীবন ধারণের খরচ নিজের আয়ে চালানোর ক্ষমতা নেই, তাদের এক সন্তানের বেশি সন্তান নেবার অধিকার থাকবে না। সমাজের ৫০ শতাংশ জনজাতি মহিলা। এই মহিলাদের মেধা দেশের উন্নয়নে কাজে না লাগালে, দেশের ও দেশবাসীর উন্নতি হবে না। একজন মা যত জ্ঞানী, শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল, মানবিক ও নীতিবান হবেন, তাঁর সন্তানও তেমন হবে। যেমন মা তেমন সন্তান, তেমন পরিবার, তেমন সমাজ ও দেশ। তাই মহিলাদের অগ্রাধিকার দিতেই হবে। এবিষয়ে বিরোধীদের দ্বিচারিতা তাদের দেউলিয়াপনাকেই তুলে ধরে।

—মৃণাল মজুমদার,
বার্লিন, জার্মানি।

মায়ের হাতে শিক্ষা গ্রহণ এবং ‘জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০’

সুতপা বসাক ভড়

বিদ্যার বাণিজ্যকরণ বর্তমানে বড়োই প্রকট হয়ে উঠছে। আমাদের সমাজে দেখতে পাই, শিশুশ্রেণীর বিদ্যার্থীরা, যাদের বয়স আড়াই থেকে তিনবছর— তাদেরও অভিভাবকেরা টিউশন পড়ানোর ব্যবস্থা করছেন— বাড়িতে অথবা শিক্ষিকা/শিক্ষকের বাড়িতে গিয়ে। কয়েক দশক আগেও মায়েরাই সন্তানদের প্রাথমিক পড়াশোনা করিয়ে দিতেন। বিদ্যালয়ের বেশ উঁচু শ্রেণীতে পড়ার সময় অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে অনেকে বাড়ির কোনো সদস্য, প্রতিবেশী কিংবা গৃহশিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে সন্তানদের পড়াশোনা করার জন্য পাঠাতেন। এতে বাচ্চাদের পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে মা-বাবা, অভিভাবক-স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে একটি সুস্থ সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠত। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে তাঁরা বিদ্যার্থীদের অনেক কথা বলতেন, সেগুলি অনেক সময় পাঠ্য বিদ্যালয়ের থেকেও বেশি শিক্ষণীয় হয়ে উঠত। আদর্শবোধ, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলত ছোটোদের মনের মধ্যে, তৈরি হতো একেক জন— ‘মানুষ’।

এখন শিক্ষা বিক্রি হচ্ছে। বেশ কিছু নামি কোম্পানি শিক্ষার প্যাকেজ বানিয়ে বিক্রি করছে। অনেক অভিভাবকেরা অর্থের বিনিময়ে ওইগুলি কিনে সন্তানদের জোর করে শেখাতে উৎসুক হন। আরও খারাপ দিক হলো, ওই শিক্ষা পদ্ধতির জন্য আবশ্যক হলো— কম্পিউটার, ট্যাবলেট, নিদেনপক্ষে মুঠোফোন। বাস্তব হলো— শিশুরা পড়াশোনা করতে ওইগুলি চালায়, কিন্তু কখন যে পাঠ্যবিষয় ছেড়ে ইন্টারনেটের মোহজালে আবদ্ধ হয়ে যেতে থাকে, সে বিষয়ে অভিভাবক বা গৃহশিক্ষক কেউই যথেষ্ট যত্নশীল হয়ে উঠতে পারেন না। এছাড়া বাল্যাবস্থা থেকেই চোখ, কান, মস্তিষ্ক ইত্যাদির ওপর অনাবশ্যক অত্যধিক চাপ দেওয়ার কারণে শিশুরা মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতার শিকার হয়ে পড়ছে। তাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা। ইন্টারনেটের দুনিয়ায় তারা ছোটোবেলা থেকেই হারিয়ে যেতে বসেছে। শিশুসুলভ কোমলতার কোনো অস্তিত্বই যেন নেই! কতগুলো তথ্য দিয়ে মস্তিষ্কের অধিকাংশ স্থান ভরে ফেলাই যেন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য।

আমরা মহাভারতে দেখতে পাই, অর্জুনপুত্র অভিমন্যু মায়ের গর্ভে থাকাকালীন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। রামায়ণে লব-কুশের প্রাথমিক শিক্ষা মা জানকীর কাছে। শিবাজীর শিক্ষাগ্রহণ মাতা জীজাবাঈয়ের কাছে। এইরকম অসংখ্য উদাহরণ আমাদের ইতিহাসে দেখতে পাই। মায়ের কাছে শিক্ষাগ্রহণ অনেক বেশি আন্তরিক, গভীর, আদর্শ, সমৃদ্ধ। এছাড়াও বাড়ির অভিভাবকেরা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত— আমাদের দেশের ইতিহাস কাহিনির মতো করে ছোটোদের শোনাতেন, যা শিশুদের মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি, দেশপ্রেমের মতো সদ্‌গুণের অনায়াস বিকাশ সাধনে সহায়ক ছিল। মাটির তালের মতো শিশুমনকে নিজ দেশ এবং আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান করে তুলতে সাহায্য করত। বড়ো হয়ে তারা স্বাভাবিকভাবেই পরিবার, সমাজ এবং দেশের প্রতি সমর্পিত হয়ে উঠেছে। এখনকার পাঠ্য বিষয় নীতিহীন, যথার্থ শিক্ষাহীন। কতগুলো তথ্য মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে নিলেই কি তারা যথার্থ মানুষ-রূপে নিজেদের আদৌ প্রমাণ করতে পারবে?

‘জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০’-এর শুরুতেই বলা হয়েছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিশুরা যেন বড়ো হয়ে ব্যক্তি, সমাজ এবং দেশের সর্বার্থ কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়। তাদের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে ধীরে ধীরে অবগত করানোর চেষ্টা করতে হবে। তাদের মধ্যে যে উদ্ভাবনী শক্তি আছে, সেগুলিকে যথাযোগ্য সুযোগ করে দিতে হবে। আমাদের দেশের জ্ঞানপরম্পরা অনুসারে যেন তাদের শিক্ষিত করা হয়। আমাদের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়— তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, বল্লভী-র গৌরবময় অধ্যায় তাদেরও জানা উচিত। শ্রদ্ধার সঙ্গে তারা স্মরণ করবে আমাদের বিদ্বান-বিদুষীদের’ চরক, সুশ্রুৎ, আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত, নাগার্জুন, শঙ্করদেব, মৈত্রেয়ী, গার্গী, অপলা— যাঁরা বিশ্বকে দিয়েছেন গণিত, জ্যোতিষ, ধাতুবিদ্যা, শরীরবিদ্যা ও অস্ত্রোপচার, জাহাজ নির্মাণ বিদ্যা, যোগ কলা, দর্শন, দাবা আরও অনেক কিছু।

এইভাবে বিদ্যার্থীর মধ্যে আত্মসম্মান, আত্মগৌরব, আত্মসচেতনতা, দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে হবে। বিশ্বের দরবারে ভারতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে অর্থনৈতিক, শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কলা, খেলা-ধূলা সর্বক্ষেত্রে। আমাদের দেশের যুবশক্তির সংখ্যা অনেক বেশি। সেজন্য দায়িত্বশীল নতুন প্রজন্মকে করতে হবে দেশের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব।

অর্থের বিনিময়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা জ্ঞান নয়— কতগুলো তথ্যের সমষ্টিমাত্র। মায়েরা নিজ সন্তানদের যতটা বোঝেন, তার সিকিভাগও ওই কোম্পানিগুলো বোঝে না। দুর্বল, স্বার্থান্বেষী, সংকীর্ণমনা মানুষ তৈরি করে তারা। কোম্পানিগুলির একমাত্র লক্ষ্য হলো যেন-তেন-প্রকারেণ অর্থ উপার্জন। বিদ্যার্থীর মঙ্গলকামনা তাদের কাছে গৌণ।

শিশুরা অতি স্বাভাবিকভাবে গর্ভধারিণীর কাছে শিক্ষালাভ করে থাকে। এই শিক্ষা হলো পারম্পরিক, সাধারণত : খেলার ছলে, আদর করে, খাবার সময় জলু বলে, ঘুম পাড়ানোর সময় চলে এই শিক্ষাদান এবং এর সঙ্গেই গভীর যোগসূত্র স্থাপন হয় সন্তানের। সেজন্য যতশীঘ্র সম্ভব ওই কোম্পানিগুলির মোহজাল থেকে বেরিয়ে, অর্থের বিনিময়ে সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্মাণ থেকে বিরত থেকে সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যাচর্চার দায়িত্ব মায়েরাই নেবেন— এমনটাই বাঞ্ছনীয়। □

গর্ভাবস্থায় শিশুর বৃদ্ধি ধীরে হলে মা ও শিশু উভয়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

গর্ভাবস্থায় শিশুর ওজন বা বৃদ্ধি যদি গর্ভকাল অনুযায়ী স্বাভাবিকের তুলনায় কম দেখা যায়, তখন এটিকে ফিটাল গ্রোথ রেস্ট্রিকশন (এফজিআর) বা 'গ্রোথ স্লো' বলা হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এটি একটি

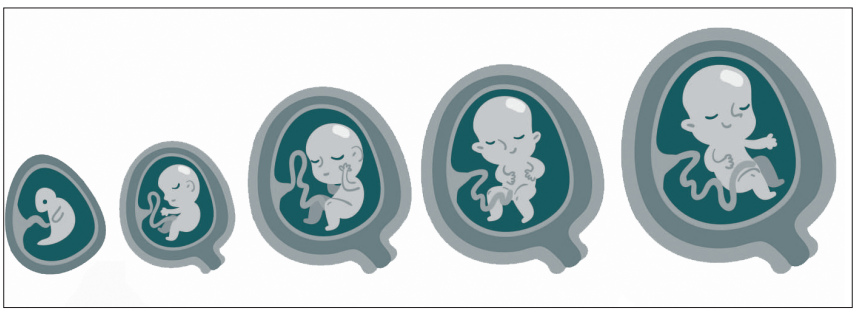

গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা, যা মা ও শিশুর উভয়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। অভিজ্ঞ গাইনি বিশেষজ্ঞরা বলছেন সঠিক সময়ে ধরা পড়লে এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রোথ উন্নত করা সম্ভব। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিশুর গ্রোথ স্লো হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে বেশি দেখা যায়— প্লাসেন্টার অকার্যকারিতা, উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস, মায়ের রক্তস্বল্পতা, পুষ্টির অভাব, থাইরয়েড সমস্যা, ইনফেকশন এবং ধূমপান বা তামাক ব্যবহারের প্রভাব।

আল্ট্রাসাউন্ডে এফজিআর ধরা পড়লে কী করবেন?

প্রথম করণীয় হলো দ্রুত একজন অভিজ্ঞ স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যাওয়া। পরিস্থিতি মূল্যায়নে টার্গেটেড আল্ট্রাসাউন্ড, ডপলার স্টাডি, বেবির বায়োমেট্রি, জলের পরিমাণ, প্লাসেন্টার অবস্থা এবং আম্বিলিকাল আর্টারি ডপলার পরীক্ষা করা খুব জরুরি। এসব রিপোর্টই চিকিৎসার মূল দিক নির্ধারণ করে।

মায়ের স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণ জরুরি, অনেক সময় মায়ের শারীরিক সমস্যা শিশুর গ্রোথ কমিয়ে দেয়। যেমন—

রক্তচাপ বেশি হলে নিয়মিত ইচ মনিটারিং ও ওষুধ, ডায়াবেটিস থাকলে সুগার কন্ট্রোল, রক্তস্বল্পতা কমাতে আয়রন ও ফোলেট, থাইরয়েড সমস্যা হলে নিয়মিত ওষুধ, এসব নিয়ন্ত্রণ না করলে শিশুর গ্রোথ বাড়ানো সম্ভব নয়।

পুষ্টি-গ্রোথ উন্নতির মূল চাবিকাঠি

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিদিন পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার না খেলে বেবির ওজন বাড়তে দেরি হয়। এজন্য ডিম, দুধ, মাছ-মাংস-ডাল, সবজি, ফল, বাদাম, দই এবং প্রয়োজন হলে প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কম পরিমাণে বারবার খাওয়া, পর্যাপ্ত জল পান এবং যথেষ্ট বিশ্রাম খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বাম দিকে কাত হয়ে বিশ্রাম কেন জরুরি?

বাম দিকে কাত হয়ে শোয়া অবস্থায় প্লাসেন্টায় রক্তসঞ্চালন বাড়ে, ফলে বেবি বেশি অক্সিজেন ও পুষ্টি পায়— যা গ্রোথ উন্নত করে। ওষুধ নিয়মিত খাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আয়রন, ক্যালসিয়াম, ফোলিক অ্যাসিড, প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট এবং প্রয়োজন হলে অ্যাসপিরিন— এসব ওষুধ গ্রোথ সাপোর্ট করতে সাহায্য করে। চিকিৎসকের নির্দেশনা ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।

ক্ষতিকর অভ্যাস সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে

ধূমপান, তামাক, অ্যালকোহল, অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং রাত জাগা— এসব অভ্যাস সরাসরি শিশুর গ্রোথে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

নিয়মিত গ্রোথ মনিটারিং জরুরি

সাধারণ প্রতি ১-২ সপ্তাহে বেবির গ্রোথ, ডপলার এবং এনএসটি পরীক্ষা করা হয়। কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়।

কখন হাসপাতালে ভর্তি হতে পারে?

যদি বেবির দেহে জল কমে যায়, ডপলারে রক্তপ্রবাহে সমস্যা দেখা দেয়, বেবির নড়াচড়া কমে যায় বা মায়ের ইচ খুব বেড়ে যায়— তাহলে হাসপাতালে ভর্তি রেখে পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন হতে পারে।

ডেলিভারির সময় নির্ধারণ কীভাবে হয়?

৩৬-৩৭ সপ্তাহের পরও যদি গ্রোথ না হয় বা ডপলার খারাপ হয়— তাহলে অনেক সময় বেবির নিরাপত্তার জন্য আগেই ডেলিভারির সিদ্ধান্ত নিতে হয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করে মা ও শিশুর অবস্থার ওপর।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভয় বা দুশ্চিন্তা নয়, নিয়মিত ফলোআপ-ই এফজিআর ব্যবস্থাপনার মূল চাবিকাঠি। সময়মতো শনাক্ত হলে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চললে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিশুর গ্রোথ উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি করা সম্ভব। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায়। □

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হিন্দুত্ব

রাজদীপ মিশ্র

বঙ্গের নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন আমাদের বড়ো প্রিয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকৃতি, পূজা ও প্রেম পর্যায় ছাড়াও তাঁর স্বদেশচেতনামূলক রচনাগুলিও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। এছাড়াও তিনি হিন্দু ধর্ম, হিন্দু দর্শন, বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, উপনিষদের বাণীকে সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর গীতি-কাব্য-কবিতার মাধ্যমে বর্ণনা করে বাঙ্গালিকে হিন্দুত্বের পাঠ পড়িয়েছিলেন, বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর ১৮টি খণ্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হিন্দুধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর দার্শনিক মতামত।

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে এই শ্রদ্ধাবোধ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পরিবার থেকে বিশেষ করে বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের ব্রত ছিল বেদ-উপনিষদ বর্ণিত এক ও অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মের সাধনা। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে যখন বিভেদকামী প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তখন তিনি গর্জে উঠেছিলেন। তাঁর কাছে ব্রাহ্মমত ছিল মূর্তিপূজা বর্জিত উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্ম। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন— 'হিন্দুধর্ম অতি প্রশস্ত ও উদার ধর্ম—ইহা সকল প্রকার উন্নতি আপনার মধ্যে নিবিষ্ট করিতে পারে।' কয়েকবছর পরে ব্রাহ্মরা আবার যখন বললেন, 'আমরা হিন্দু নই, আমরা ব্রাহ্ম, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাবার মতোই তীব্র প্রতিবাদ করে তাঁর বিখ্যাত 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে লিখলেন— 'আমাদের নিজস্ব পরিচয় হচ্ছে আমরা হিন্দু, তারপর আমরা অন্য কিছু।'

এই বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে অন্যত্র তিনি লিখেছেন, ''বর্তমানকালে আমরা কেহ কেহ এই লইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, আমরা আর কিছুই নই, আমরা ব্রাহ্ম। কিন্তু সেটাও তো একটা নূতন পরিচয় হইল, সে পরিচয়ের শিকড় তো বেশিদূর যায় না। আমি হয়তো গতকাল ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষা লইয়া প্রবেশ করিয়াছি। ইহার চেয়ে পুরাতন ও পাকা পরিচয়ের ভিত্তি আমার কিছু নাই? অতীতকাল হইতে প্রবাহিত কোনো একটি নিত্য লক্ষণ কি আমার মধ্যে একেবারেই বর্তায় নাই?

এরূপ কখনো সম্ভব হইতে পারে না, অতীতের লোপ করিয়া দিই এমন সাধ্যই আমার নাই। সুতরাং সেই অতীতের পরিচয় আমার ইচ্ছার উপর লেশমাত্র নির্ভর করিতেছে না। অতএব আমি হিন্দু একথা বলিতে যদি নিতান্তই কোনো লজ্জার কারণও থাকে, তবে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতেই হইবে। কারণ বিধাতার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে হইলে সেই আদালতের জজ পাইব কোথায়?" (রবীন্দ্র রচনাবলী— ১৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৬)

অর্থাৎ তাঁর মতে, বিধাতাই আমাদের হিন্দু হিসেবে জন্ম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন— ''হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বোঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নয়। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম।"

কৈশোর থেকে প্রৌঢ় তাঁর জীবনের সমগ্র অংশেই ছিল ভারতের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ। শিক্ষিত বাঙ্গালির মনে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটাতে রাজনারায়ণ বসুর পরিকল্পনা আর নবগোপাল মিত্রের সক্রিয় প্রচেষ্টায় রূপ পেল হিন্দুমেলা— ১৮৬৭ সাল, ১২ এপ্রিল। ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে এই মেলা শুরু। রবীন্দ্রনাথ এই মেলা সম্বন্ধে বলেছেন, 'ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম। হিন্দুমেলায় দেশের স্তবগান, দেশানুরাগের কবিতা, দেশীয় শিল্প ও ব্যায়াম প্রদর্শিত এবং গুণীজন সমাদৃত হইতেন।' গোড়া থেকেই কিশোর রবীন্দ্রনাথের এই হিন্দু মেলায় যোগদান থাকত। স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন, গান গাইতেন। 'হিন্দুমেলার উপহার', 'হোক ভারতের জয়' শীর্ষক সেসব কবিতার ছত্রে ছত্রে ছিল ভারতের জয়গান। ১৮৭৭ সালে হিন্দুমেলার একাদশ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ যে স্বরচিত কবিতাটি পাঠ করেছিলেন, সেটি বড়লাট লিটনের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত তখনকার দিল্লির দরবার নিয়ে—

'হারে হতভাগ্য ভারতভূমি
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে?
...যে গায় গাক, আমরা গাবো না
আমরা গাব না হরষ গান
এসো আমার যে ক'জন আছি
আমরা ধরিব আরেক তান।'

হিন্দুত্বের আদর্শে ভবিষ্যৎ ভারত নির্মাণের এক মহামন্ত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রচার করেন। ১৮৯৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা

অধিবেশনে নিজস্ব স্বরলিপিতে রবীন্দ্রনাথ গাইলেন 'বন্দে মাতরম্' গান। রচনা করলেন 'অয়িভুবনমনমোহিনী'।

স্বদেশী যুগের ভাষাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কথা ও কাহিনী'র প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি রচনা করেন। প্রাচীন ভারত এবং আধুনিককালে মরাঠি, রাজপুত ও শিখ ইতিহাসের গৌরবময় স্মৃতি মন্থন করে এইসব কবিতা রচিত হয়েছিল। বঙ্গের তরুণদের হৃদয়ে স্বদেশের বীর্য ও গৌরবকাহিনি জাগ্রত করাই ছিল ওইসব কবিতার উদ্দেশ্য। সখারাম গণেশ দেউস্কর বঙ্গদেশে শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ যাতায়াত। ১৯০৪ সালে শিবাজী উৎসব উপলক্ষ্যে সখারাম বিশ্বকবিকে একটি কবিতা লিখতে অনুরোধ করেন। রচিত হয় বিখ্যাত 'শিবাজী উৎসব' কবিতা। পরবর্তীকালে বালগঙ্গাধর তিলকের শিবাজী উৎসব উদ্‌যাপন থেকে সম্ভবত তিনি আরেক বিখ্যাত কবিতা 'প্রতিনিধি' রচনার প্রেরণা পান। এই কবিতায় তিনি শিবাজীর রাজর্ষি রূপটি ফুটিয়ে তোলেন। ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে শিবাজীর রাজ্যশাসন যেমন তাঁর হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিল— তেমনই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল রামদাস স্বামীর ধর্ম আন্দোলন। এই কবিতায় শিবাজীর যে ভূমিকা প্রতিফলিত হয়েছে তা শাসকের নয়, সেবকের—

''গুরু কহে তবে শোন্ করিলি কঠিন পণ
অনুরূপ নিতে হবে ভার,—
এই আমি দিনু কয়ে মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহ পুনর্বার।
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন।
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।'

সন্ন্যাসীর ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং বিশ্বমানবতার সঙ্গে একাত্মতার প্রতীক গৈরিক পতাকা শিবাজীর রাজধর্মের অবলম্বন ছিল। তিনি এই আদর্শে দীক্ষিত হয়েছেন। তাঁর কথায়—

'বৎস, তবে এই লহ মোর আশীর্বাদ সহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস—
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিও
কহিলেন গুরু রামদাস।'

শিবাজীর এই রাজ আদর্শ মুগ্ধ করেছিল রবীন্দ্রনাথকে।

আমাদের পুরাণে, ইতিহাসে যেখানেই অনুপম মনুষ্যত্ববোধের সন্ধান পেয়েছেন, তাকেই তিনি কাব্যরূপ দিয়েছেন। যেমন— 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন'—এর মতো নাট্যকবিতা, 'পূজারিণী', 'অভিসার'-এর মতো বৌদ্ধযুগীয় কাহিনীর কাব্যরূপ, 'বন্দিবীর', 'হোরিখেলা', 'গুরুগোবিন্দ'-র মতো রাজপুত-মরাঠা-শিখ ইতিহাস ভিত্তিক কবিতা।

শান্তিনিকেতনে 'বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠাতেও সনাতন ধর্মের পরম্পরার প্রতি রবীন্দ্রনাথের নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

জনগণমনঅধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতার মধ্যে যে বিরাট জাতিসত্তা আছে, সেটাই হিন্দুত্ব। 'হিন্দুত্ব' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ১৮৯১ সালে তাঁর 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' প্রবন্ধে। এখানে তিনি ভারতসত্তাকেই 'হিন্দুত্ব' বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

উপাসনা পদ্ধতি যাই হোক না কেন ভারতবর্ষে বসবাসকারী সকলের পরিচয়ই 'হিন্দু'। এই মত রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। ভারতবর্ষে জাতীয়তা শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো 'হিন্দুত্ব'। তাঁর দৃষ্টিতে হিন্দু কেবলমাত্র একটি ধর্ম নয়, একটি সংস্কৃতি, একটি জীবন দর্শন। তিনি এদেশের মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ— এমনকী নাস্তিক সম্প্রদায়কেও বলতেন— হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু-খ্রিস্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ, হিন্দু-জৈন, হিন্দু-শিখ, হিন্দু-নাস্তিক প্রভৃতি নামে।

তিনি একস্থানে বলেছেন, ''তবে কি মুসলমান অথবা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও কি তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে তর্ক মাত্র নাই।... কালিচরণ বাঁড়ুজ্জেমশাই হিন্দু-খ্রিস্টান ছিলেন, তাহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু-খ্রিস্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রিস্টান। বাংলাদেশে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নয়, হিন্দু নয় শুনাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দু মুসলমান। হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয় বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম। কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের জাতিগত পরিণাম।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা-১৮৪)।

রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় মর্যাদাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি পাওয়া যায়। মহর্ষি বাল্মীকি, রামায়ণ ও রামরাজত্বের কথা তাঁর 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) গীতিনাট্যে, 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭), 'আত্মশক্তি' (১৯০৫), 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭), 'পরিচয়' (১৯১৬), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) বিচিত্র প্রকৃতির প্রবন্ধ গ্রন্থে, 'জাভাযাত্রীর' পত্র' (১৯২৯) ভ্রমণ সাহিত্যে বা 'কাহিনী' (১৯০০) কাব্যে নানাভাবে রাম-রামায়ণের কথা উঠে এসেছে।

'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন— 'বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে না তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।'

আবার 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে তিনি বলছেন— ''রামের জীবনের সকল কার্যেই উদার বীর্যবান সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। একথা ভারতবর্ষ ভুলিতে পারে নাই যে তিনি চণ্ডালের মিতা, বানরের দেবতা, বিভীষণের বন্ধু ছিলেন। তিনি শত্রুকে ক্ষয় করিয়াছিলেন, এ তাহার গৌরব নহে। তিনি শত্রুকে আপন করিয়াছিলেন।"

বাঙ্গালি ছেলে-মেয়েদের রামায়ণ পড়া কতখানি দরকার তা তিনি যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত 'সরল কৃত্তিবাস' বইটির ভূমিকায় লিখেছেন, 'কৃত্তিবাসের রামায়ণ যদি বাঙ্গালি ছেলে-মেয়েরা না পড়ে তবে তার চেয়ে শোচনীয় আশঙ্কা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না।' কাজেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন আদ্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, হিন্দুধর্মের বিজয় পতাকার ধারক, বাহক ও প্রচারক। তাঁর গানের দুটি লাইন দিয়ে বর্তমান প্রবন্ধটি শেষ করা যেতে পারে—

'ধর্ম যবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিও প্রাণ।' ■

কবিগুরুর সমাজসচেতনতা

বৈশাখী কুণ্ডু

কেউ বলেন কবিগুরু, কেউ বলেন গুরুদেব, কেউ-বা বিশ্বকবি। তিনি একাধারে কবি, লেখক, সুরকার, চিত্রশিল্পী, দার্শনিক, আরও অনেক কিছু। আবার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমিদারি, সেটাও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন। সংস্কৃতিরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এই সব সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়েই আবার কিছু সামাজিক বার্তা দিয়ে গেছেন যা শিশু বয়স থেকে পরিণত বয়সের রচনায় বেশ কিছু নিদর্শন দেখা যায়। যেমন—

'আজ মঙ্গলবার। পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন। সব ছেলেরা দঙ্গল বেঁধে যাবে। সঙ্গে নিতে হবে কুড়ুল, ঝাঁটা, ঝুঁড়ি, কোদাল।' অতি পরিচিত পঙ্‌ক্তি 'সহজ পাঠ' পুস্তকের। কবি পুস্তকটি শিশুদের কাছে জনপ্রিয় করার জন্য নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি দিলেন। বর্ণ পরিচয়ের পরে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে শিশুদের কাছে এই পুস্তকটির পরিচয় ঘটে। অনেক রকম শিক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। শিশুমনে বাংলাভাষার রসবোধ জাগিয়ে তোলার প্রথম ধাপ। গ্রামবাঙ্গলার বিভিন্ন আঙ্গিকের ছবি চিত্র-সহ ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি নির্দিষ্ট দিনে সবাই মিলেমিশে নিজেদের এলাকা অর্থাৎ যেখানে বসবাস করে সেই জায়গাটা পরিষ্কার করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছে। শুধু নিজের বাড়িটা নয়, নিজের এলাকাটিও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় এবং সকলের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার অভ্যাস তৈরি করা যা শিশু বয়স থেকেই তৈরি হওয়া প্রয়োজন বলে কবি মনে করতেন।

কবি সবুজ সংরক্ষণের ডাক দিয়েছেন। উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলতে গিয়ে যথেচ্ছভাবে বনজঙ্গল সাফ করে বহুতল নির্মাণ করছে। কিন্তু প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে বৃক্ষরোপণ বা সবুজ সংরক্ষণ বিশেষ প্রয়োজন। বেশ কয়েকটি লেখার মাধ্যমে তিনি সেই আহ্বান করেছেন। কবি নিজে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। কবির ৬৪ বছরের জন্মদিনে প্রথম এই উৎসবের সূচনা। উত্তরায়ণে উত্তরপথের ধারে পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অশ্বত্থ, বট, আমলকি, অশোক, বেল ইত্যাদি গাছের চারা নিজের হাতে রোপণ করেছিলেন। এরপর ১৯২৮ সালে ১৪ জুলাই বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শান্তিনিকেতনের পিয়ারসন পল্লীতে। কবি তাঁর মামনির (প্রতিমা দেবী) সাধের বকুলগাছটিকে অনুষ্ঠান স্থলে নিয়ে এসে রোপণ করেন। বালিকারা সুসজ্জিত পোশাকে শঙ্খ বাদন সহযোগে সঙ্গীত পরিবেশন করতে করতে গাছটিকে অনুষ্ঠান স্থলে নিয়ে আসে। তারপর থেকেই বৃক্ষরোপণ উৎসব শান্তিনিকেতনে অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানের মতোই ভিন্ন মাত্রা পেয়ে আসছে। ১৯৩৬ সালে আশ্রমের ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে ভুবনডাঙায় বৃক্ষরোপণ ও বর্ষামঙ্গল উৎসব পালিত হয়। গ্রামে একটি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিবছর গুরুদেব এই উপলক্ষ্যে গান, কবিতা রচনা করেছেন।

রবি ঠাকুরের অনেক পরিচয়। কিন্তু যেকোনো পুরনো নথিপত্রে তাঁর পেশা জমিদার বলেই উল্লেখ রয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। কবি শিলাইদহে জমিদারির ভার গ্রহণ করেছেন। জমিদার হয়ে প্রথমবার গেছেন পুণ্যাহ উৎসবে যোগদান করতে। নতুন জমিদারকে স্বাগত জানাতে রোশনচৌকি বসল। বন্দুক দাগা হলো। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি করা হলো। ধুতি-পাঞ্জাবি ও চাদর পরিহিত জমিদার শিলাইদহের কাছারি বাড়িতে পা রাখলেন। কিন্তু সদ্য ভারপ্রাপ্ত জমিদার ভীষণ গম্ভীর মুখে রয়েছেন। সকলেই চিন্তিত যে কোনো ত্রুটি হলো কিনা! জিজ্ঞাসা করতে জমিদার রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন জমিদারের জন্য সুসজ্জিত সিংহাসন এবং ব্রাহ্মণ, হিন্দু, মুসলমানদের বসার জায়গা আলাদা হবার কারণ কী? ঠাকুর্দা দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে--- নায়েব মশাই অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু কবি এভাবে অর্থাৎ জাত পাত মেনে জমিদারি সামলাবেন না। সবাইকে একসঙ্গে বসতে হবে। একেবারে নাছোড়বান্দা। অবশেষে কবির উদ্যোগে জমিদার ও প্রজা একাসনে বসল।

এরপর আমরা দেখেছি, কবি তাঁর পুত্র ও জামাতা নগেন্দ্রনাথকে আমেরিকার ইলিনিয়স ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করতে। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর জমিদারি এলাকায় কৃষির উন্নতি সাধন করা। গুরুদেব উপলব্ধি করেছেন নগরের উন্নতি সাধন করতে গেলে গ্রামীণ

সভ্যতার উন্নতি প্রয়োজন। ১৯২২ সালে গ্রামীণ মানুষের জীবনচর্যা ও কৃষির উন্নতিতে তৈরি করলেন শ্রীনিকেতন। ১৯২৮ সালে কৃষিকাজের উন্নতি ও গ্রামীণ মানুষদের উৎসাহ দিতে শুরু করলেন হলকর্ষণ উৎসব। কবি নিজে হাল চালনা করেছেন। ক্ষিতিমোহন সেন এই উৎসবে মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন।

শিলাইদহে একটি কৃষিখামার তৈরি হয়েছিল। অনেকটা জমি নিয়ে খেতখামার, উন্নত মানের লাঙল, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য গবেষণাগার তৈরি হয়েছিল। অবহেলিত পতিসর এলাকার মানুষদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য জনহিতকর কাজ করেছিলেন। এখানকার (পতিসর) কৃষকদের কল্যাণে কবির নোবেল পুরস্কারের টাকা এক লক্ষ আট হাজার টাকা দিয়ে একটি কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেছিলেন। এছাড়াও কৃষি, তাঁত ও মৃৎশিল্পের সমবায় সংগঠন করেছিলেন। এলাকাবাসীদের শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে পুত্রের নামানুসারে 'কালীগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশন' স্থাপন করেন।

কবিগুরু পতিসরে কাটিয়েছেন দীর্ঘ সময়। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে এই অঞ্চল। এখানে তিনি লিখেছেন বিদায় অভিশাপ, কাব্যগ্রন্থ চিত্রা, উপন্যাস গোরা ও ঘরে বাইরের কিছু অংশ, ছোটগল্প প্রতিহিংসা ও ঠাকুরদা। প্রবন্ধ ইংরেজ ও ভারতবাসী। গানের মধ্যে তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার নিভৃত সাধনা, বধূ মিছে রাগ করোনা, তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে। চৈতালি কাব্যের ৫৪টি কবিতা লিখেছেন।

গুরুদেবের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম একটি হলো বর্ষামঙ্গল উৎসব। কবির প্রিয় ঋতু বর্ষা। সেই উপলক্ষ্যেই এই আয়োজন। তাঁর আশ্রমেই অনুষ্ঠানটি হবার কথা ছিল। কিন্তু আশ্রমের ছাত্র বীরেশ্বর গোস্বামীর অকাল প্রয়াণে স্থগিত রাখা হয়। পরে কলকাতার ছায়া রঙ্গমঞ্চে বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হয়। প্রিয় ঋতুকে বরণ করতে কবি প্রায় ষোলোটি গান রচনা করেছেন।

গুরুদেব মনে করতেন অধিকাংশ দেশেই শিক্ষাব্যবস্থা হলো একধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা। বিদ্যালয়গুলোতে সুস্থ মনের শিক্ষার সুযোগ নেই। তিনি বলতেন, বৃক্ষের কাণ্ডটি মজবুত হয়ে উঠলেই বৃক্ষের পরিচর্যা সার্থক হয় না— শাখায় শাখায় পত্রে-পল্লবে, ফুলে- ফলে বিকশিত হয়ে উঠলে তবেই সে সার্থক। শিকড়ের সাহায্যে শুধু মাটির রসটুকু নিলেই হবে না, সূর্যতাপ ও মুক্তবায়ু পর্যাপ্ত পরিমাণে নিতে পারলেই গাছ সজীব ও সতেজ হবে। মনের পুষ্টির জন্য শুধু পুস্তক নয়, বহুবিধ উপকরণের প্রয়োজন। শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করতে গেলে প্রকৃতির সৃজনশীল আনন্দকে শিক্ষার কেন্দ্রে বসাতে হবে। কবি শান্তিনিকেতনে যে বিদ্যালয় স্থাপন করলেন সেটি হলো একটি আবাসিক বিদ্যালয়। যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিলে গড়ে উঠল একটি যৌথ পরিবার— একসঙ্গে পঠনপাঠন, খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলা ইত্যাদি। তথাকথিত স্কুল-কলেজের শিক্ষার গতানুগতিক ধারা শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বা পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায়নি। তাই নিয়ে অনেকের মনে ক্ষোভ ছিল। কিন্তু তাই বলে কবি স্বধর্ম ত্যাগ করেননি। শ্রেণীকক্ষে নয়, গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় ছাত্রদের পঠনপাঠন চলত। পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। গুরুদেব বলতেন, বিদ্যা আর শিক্ষা এক নয়। বিদ্যা আহরণের বস্তু, আর শিক্ষা আচরণের। বিদ্যাকে স্বভাবগত করতে পারলেই শিক্ষায় পরিণত হবে।

আশ্রম চালনা করতে গিয়ে প্রভূত আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। সেইসময় তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা পাশে ছিলেন। এরপরেও একটাই কথা বলতে হয়, অভাবই শান্তিনিকেতনের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। কবির স্বপ্নের বিশ্বভারতীকে (পৃথিবীর সরস্বতী) ঘিরে অনেক আশা, অনেক ইচ্ছা। সাধ্যমতো অনেকটাই করেছেন। বাধা এসেছে বিস্তর, তা ভেদ করে এগিয়ে গেছেন জনস্বার্থে।

ভারতীয় নৃত্যে কবিগুরুর অবদান অপরিসীম। কবি অনুধাবন করলেন আমাদের দেশের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানচর্চার অভাব। ছাত্রদের চিত্তের পূর্ণ বিকাশের জন্য সংস্কৃতিচর্চা যেমন--- কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্যগীতবাদ্য, নাট্যাভিনয়, পল্লিহিত সাধন ইত্যাদি চর্চার প্রয়োজন। তিনি নিজে নৃত্যশিল্পী বা নৃত্য গবেষক ছিলেন না। কিন্তু তিনি সুন্দরের পূজারি ছিলেন। সারা বিশ্ব ভ্রমণ করে যেখানে যা কিছু ভালো দেখেছেন নিয়ে এসেছেন বিশ্বভারতীর ছেলে- মেয়েদের জন্য। বেশ কিছু বিদেশি নৃত্য এবং বেশ কয়েকটি শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্য শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল তখনকার বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীরা যার প্রয়োগ কবির নৃত্যনাট্যগুলিতে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের অবলুপ্ত শাস্ত্রীয় নৃত্য মোহিনীআট্টম গুরুদেবের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম শেখে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা। এছাড়াও আরও কিছু নৃত্য তাঁর স্পর্শে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গুরুদেবের প্রচেষ্টাতেই শিক্ষিত, ভদ্র পরিবারের মহিলারা মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করার সুযোগ পায়। কারণ ব্রিটিশ রাজত্বকালে নৃত্য বাইজি স্তরে চলে গিয়েছিল। ফলে শিক্ষিত সমাজ নৃত্যকে সম্মানজনক চোখে দেখত না। এই পরিস্থিতি কবিকে বিচলিত করে তুলেছিল। তিনি বিশ্বভারতীতে নৃত্যকে পাঠ্যের অন্তর্গত করেন। গুরুদেবের বিশ্বভারতী (১৯২১ সালে) স্থাপনের পর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারী কবি ভাল্লাথোল নারায়ণন মেনন কেরালা কলামণ্ডলম (১৯৩০ সালে) এবং (১৯৩৬ সালে) রুক্মিণী দেবী আরুণ্ডেলে কলাক্ষেত্র স্থাপন করেন।

স্রোতের বিপরীতে পদার্পণ করে সমাজের অনেক হিতকর কার্য সাধন করেছেন। কিন্তু সমাজ আজও তার পুরোটা গ্রহণ করতে পারেনি। প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করেছেন সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার কথা।

(লেখিকা গৌড়ীয় নৃত্য সাধিকা)

নয়াদিল্লিতে ‘সংস্কৃতভারতী’র কেন্দ্রীয় কার্যালয় উদ্বোধন

গত ২০ এপ্রিল, পবিত্র অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে দেশের রাজধানী নয়াদিল্লিতে ‘প্রণব’-নামক ‘সংস্কৃতভারতী’র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত। উপস্থিত জনসমাবেশকে সম্বোধন করে মোহনজী বলেন যে, অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ মুহূর্তে ‘প্রণব’ কার্যালয়ের উদ্বোধন অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও শুভ সংকেত। এটি একটি সত্য সংকল্প। ‘প্রণব’ হলো সৃষ্টির মূল ধ্বনির প্রতীক এবং এই নামে শুরু হওয়া এই কাজ পূর্ণতাপ্রাপ্তির লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। তিনি সংস্কৃতকে ভারতের প্রাণ বলে অভিহিত করে বলেন যে, এটি কেবল একটি ভাষা নয়, বরং ভারতের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনদর্শনের ভিত্তিপ্রস্তর। ভারতকে বোঝার জন্য সংস্কৃতকে বোঝা অপরিহার্য, কারণ এর মধ্যেই ভারতীয়দের জ্ঞান-ঐতিহ্য, দর্শন ও জীবনবোধ নিহিত শিবিরগুলি এই ব্যাপারে অত্যন্ত উপযোগী এবং এগুলির মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে ভাষাজ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। সংস্কৃতরে হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে যদি উদ্যোগী হতে হয়, তবে একে লোকভাষায় (অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ভাষায়)

রয়েছে। সংস্কৃত কেবল একটি ভাষা নয়, বরং ভারতের প্রাণ। এটি আমাদের চিন্তাভাবনা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের সেই সারমর্ম যা সমগ্র বিশ্বকে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

তিনি বলেন যে, সংস্কৃত সমস্ত ভারতীয় ভাষাকে সংযুক্ত করার একটি যোগসূত্র এবং এর মাধ্যমে অন্যান্য ভাষাও সহজে শেখা সম্ভব। সংস্কৃতে নিহিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক ভাণ্ডার সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রয়োজনীয়। সংস্কৃত ভারতীর কার্যকর্তাদের সম্বোধন করে তিনি বলেন সংস্কৃত ভাষায় কথা বলার অভ্যাস ও কথোপকথনের মাধ্যমে সহজেই এই ভাষাকে করায়ত্ত করা যায়। সংস্কৃত সম্ভাষণ পরিণত করতে হবে। ভারতকে বোঝার জন্য সংস্কৃত অপরিহার্য।

সংস্কৃত ভাষার পুনরুত্থান এবং বিশ্বব্যাপী প্রসারের জন্য নিবেদিত সংগঠন ‘সংস্কৃতভারতী’র নবনির্মিত কেন্দ্রীয় কার্যালয়— ‘প্রণব’-নামক এই অত্যাধুনিক ভবনটির উদ্বোধন পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকের করকমলে বিধিবৎ সম্পন্ন হয়। উদ্বোধনের আগে বৈদিক ঐতিহ্য অনুযায়ী পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক ‘গাবো বিশ্বস্য মাতরঃ’ (গাভী বিশ্বের মাতা) ভাবনার সঙ্গে গোমাতার পূজার্চনা করেন এবং শতচণ্ডী যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করেন। আচার্য সুধীর বেদপাঠী, অধ্যাপক রামরাজ উপাধ্যায় ও অধ্যাপক পরমানন্দ ভরদ্বাজের সান্নিধ্যে সম্পূর্ণ বৈদিক বিধি-বিধানের সঙ্গে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। এরপর পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক আনুষ্ঠানিকভাবে ‘প্রণব’ ভবনের উদ্বোধন করেন এবং ভবনটি পরিদর্শন করেন। এই উপলক্ষ্যে

সংস্কৃতভারতীর সর্বভারতীয় সভাপতি অধ্যাপক রমেশ কুমার পাণ্ডে সকলকে স্বাগত জানান এবং সর্বভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী জয়প্রকাশ গৌতম 'প্রণব' ভবনের কাঠামো, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে প্রেরিত অভিনন্দন বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে, অক্ষয় তৃতীয়ার পবিত্র লগ্নে 'প্রণব' কার্যালয়ের উদ্বোধন অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। তিনি একে ভারতীয় জ্ঞান-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক চেতনার পুনর্জাগরণের পথে একটি প্রেরণাদায়ক পদক্ষেপ হিসেবে তাঁর প্রেরিত বার্তায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সংস্কৃত ভারতের প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের বাহক, যাতে নিহিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন মানবতার অমূল্য সম্পদ। জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে ভারতীয় ভাষা ও জ্ঞান-ঐতিহ্যকে বিশেষ গুরুত্বদান করা হয়েছে, যা সংস্কৃতের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে নতুন দিশা প্রদর্শন করেছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, সংস্কৃত কেবল অতীতের নয়, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতেরও শক্তিশালী ভাষা এবং এই লক্ষ্যে 'প্রণব' কার্যালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে আগামীদিনে প্রমাণিত হবে। প্রধানমন্ত্রী শুভেচ্ছাবার্তা শচনী কাঠালে পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে সারদা পীঠ, শৃঙ্গেরী মঠের জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য বিধুশেখর ভারতী মহারাজের বার্তাও পাঠ করা হয়।

সংস্কৃতভারতী-র সাংগঠনিক বিস্তার ও 'প্রণব'-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের বিষয়ে সর্বভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী জয়প্রকাশ গৌতম প্রস্তাবনা পেশ করে বলেন যে, ১৯৮১ সালে সংস্কৃতকে কথ্য ভাষায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে বলেও এটি পরবর্তীতে একটি ব্যাপক সংস্কৃত আন্দোলনে বিকশিত হয় এবং ১৯৯৫ সালে 'সংস্কৃতভারতী' নাম পায়। সংগঠনের যাত্রা ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের ওপর আলোকপাত করে তিনি বলেন যে, ১৯৮১ সালে কয়েকজন ছাত্রের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই আন্দোলন আজ বিশ্বের ২৮টি দেশে এবং ভারতের ৬৬০টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। বিশাল চত্বর-সহ এই ভবনটি প্রায় ৫০,০০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই কার্যালয়টি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের এক মিলনস্থল। সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের ১০ শতাংশ জনসংখ্যার কাছে সংস্কৃত ভাষা পৌঁছে দেওয়া এবং ১২টি ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতের পঠন-পাঠন ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদান কার্যক্রমকে গতিশীল করা। এখানে স্থাপত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শের জন্য বিদ্বানরা সর্বদা উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে সমবেত বিদ্বানদের উপস্থিতি তৈরি হয় এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। সর্বাধিক সহযোগিতা প্রদানকারী ১১ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এই অনুষ্ঠানে সম্মান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সংস্কৃতভারতী-র সর্বভারতীয় সভাপতি অধ্যাপক রমেশ কুমার পাণ্ডে সকলকে স্বাগত জানান এবং দিল্লি ন্যাসের সভাপতি প্রবীণ কান্তজী ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য সুরেশ সোনী, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, পূর্বতন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ড. মুরলী মনোহর জোশী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিংহ ঠাকুর, ভারতীয় ভাষা সমিতি-র সভাপতি চমুকৃষ্ণ শাস্ত্রী, সংস্কৃত সংবর্ধন প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা অধ্যাপক চাঁদকিরণ সালুজা, সংস্কৃতভারতী-র ট্রাস্টি দিনেশ কামত, সর্বভারতীয় প্রচার প্রধান শ্রীশ দেবপূজারী, দিল্লি প্রান্তের সভাপতি ড. বাগীশ ভট্ট, আমেরিকা সংস্কৃতভারতী-র সভাপতি নটেশ জানকীরাম এবং দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, গবেষক, সংস্কৃতপ্রেমী-সহ বহু বিশিষ্টজন। এই কার্যালয় ভবনটি এখন থেকে সংস্কৃত ভাষার প্রচার-প্রসার, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সংস্কৃত ভাষা কেন্দ্রিক গবেষণার একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

প্রকৃতি পাঠে বাচামারী বিবেকানন্দ শিশুমন্দির

প্রতি বছরের মতো এবছরও গত ২২ এপ্রিল মালদহের বাচামারী বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরের ২০২৬-শিক্ষাবর্ষের উদয়শ্রেণী শিশু বাটিকা বিভাগ থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ভাই-বোনদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো প্রকৃতি অনুভবের কার্যক্রম। পঞ্চমহাভূতের অন্যতম হলো— 'জল'। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ অনুসারে উন্মুক্ত পরিবেশে প্রকৃতি পাঠের মাধ্যমে শিশুমন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া মহানন্দা নদীর উৎপত্তিস্থল-সহ এই নদীর ভৌগোলিক বৃত্তান্তের বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে নদীর চরে অনাবিল আনন্দের মাঝে হয় কালাংশের আয়োজন। সঙ্গে চলে নৌকা বিহার। এদিন সকাল থেকেই বাচামারী গভর্নমেন্ট কলোনি-সংলগ্ন মহানন্দা নদীতে শিশুদের নদীস্নানের আনন্দ-সহ জল ছিটিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে খেলা, বল নিয়ে খেলা চলে। প্রতিটি শ্রেণীর ভাই-বোনেরা ধাপে ধাপে এই প্রকৃতি পাঠে অংশগ্রহণ করে শিশুমন্দিরের আচার্য-আচার্যাদের সহযোগিতায়। উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য পঙ্কজ কুমার সরকার।

লোকপ্রজ্ঞা কাঁথি চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে ‘জাতীয় আলোচনাচক্র’

গত ৯ এপ্রিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির কালিকাপুর-স্থিত দেশপ্রাণ উৎসব ভবনে, ‘রিলিজিয়ন ও ধর্ম : ভগিনী নিবেদিতার ভাবনায় এক সভ্যতাগত পুনর্মূল্যায়ন’-শীর্ষক একদিনের জাতীয় আলোচনাচক্র সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। লোকপ্রজ্ঞা কাঁথি চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনাচক্রে প্রায় ১৫০ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও আগ্রহী অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে এক অনন্য মাত্রা প্রদান করে। অতিথিদের দ্বারা প্রদীপ প্রজ্বলন, বৈদিক মঙ্গলাচরণ ও স্বাগত সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজের অধ্যক্ষ ড. অমিত কুমার দে। তাঁর বক্তব্যে তিনি ধর্ম ও ধর্মাচরণের মধ্যে পার্থক্য, তার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা এবং বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানের অতিথি কলিয়াচক বিক্রমকিশোর আদর্শ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. নৃসিংহনাথ গুরু তাঁর বক্তব্যে ভারতীয় পরম্পরায় ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা এবং ভগিনী নিবেদিতার চিন্তাধারার আধুনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রজ্ঞাপ্রবাহের অখিল ভারতীয় সহ-সংযোজক চন্দ্রকান্ত শর্মা। তাঁর সুগভীর ও প্রাঞ্জল আলোচনায় ‘রিলিজিয়ন’, সম্প্রদায় ও ধর্মের মৌলিক পার্থক্য এবং ভারতীয় সভ্যতার প্রেক্ষিতে তার পুনর্ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। তিনি বলেন, ভারতীয় ‘ধর্ম’ কোনো সংকীর্ণ মতবাদ নয়, বরং এটি মানবকল্যাণের এক চিরন্তন জীবনদর্শন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রজ্ঞাপ্রবাহের পূর্বক্ষেত্র সংযোজক অরবিন্দ দাশ। অনুষ্ঠানে ‘বন্দে মাতরম্’-এর সার্ধশতবর্ষে কাঁথি হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ড. বাণেশ্বর দাশের লেখা ‘সার্ধশতবর্ষের আলোয় বন্দে মাতরম্’ এবং কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ড. শুভময় পাহাড়ীর লেখা ‘সার্ধশতবর্ষে বন্দে মাতরম্’ গ্রন্থ দু’টি প্রকাশিত হয়।

দেশাত্মবোধক আবহ বজায় রাখতে অনুষ্ঠানের শেষে সম্পূর্ণ ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীত পরিবেশিত হয় এবং কল্যাণমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন লোকপ্রজ্ঞা কাঁথি চর্চাকেন্দ্রের সংযোজক ড. শুভময় পাহাড়ী এবং ব্যবস্থা সম্পর্ক প্রমুখ রণদীপ দত্ত। সেমিনারের সফল আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন লোকপ্রজ্ঞা হিমালয় গটের সংযোজক সুখেন্দু বেরা, শোধ বিভাগের কার্যকর্তা সন্দীপন ভট্টাচার্য, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অসিত খামারী, বিমর্শ বিভাগের রবীন্দ্রনাথ মাল প্রমুখ। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আলোচনাচক্রটি ‘রিলিজিয়ন’ ও ‘ধর্ম’-এর গভীর তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং উপস্থিত সকলের মনে এক নতুন চিন্তার দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

টালিগঞ্জে ‘পারিবারিক মিলন উৎসব-২০২৬’

গত ২২ এপ্রিল দক্ষিণ কলকাতায় টালিগঞ্জে সিটি হাই আবাসনের সভাগৃহে আবাসিকবৃন্দ ও সচেতন নাগরিক মঞ্চের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় ‘পারিবারিক মিলন উৎসব-২০২৬’। সহযোগিতায় ছিলেন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের কার্যকর্তারা। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন চিন্ময় মিশনের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী দিবাকর চৈতন্যজী মহারাজ, সাংসদ অনুরাগ সিংহ ঠাকুর, ছত্তিশগড়ের বিধায়ক ও ছত্তিশগড় মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সৌরভ সিংহ, নেহরু যুব কেন্দ্র সংগঠনের ভাইস-চেয়ারম্যান দীনেশ সিংহ, সংস্কার ভারতী-র অন্যতম কেন্দ্রীয় সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায় এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর বৌদ্ধিক প্রমুখ মধুসূদন কর। প্রবুদ্ধ সমাজের এই মিলনোৎসবে উপস্থিত ছিলেন— প্রাক্তন বিচারক শান্তনু রায়, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ শঙ্কর কুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন চিফ ইঞ্জিনিয়ার ড. ভাস্কর সেনগুপ্ত, শিপিং ইঞ্জিনিয়ার সুজিত কুমার সেনগুপ্ত, বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তর ভ্রাতুষ্পুত্র বিজন দত্তগুপ্ত ও ভ্রাতুষ্পৌত্র কৌশিক দত্তগুপ্ত, বিপ্লবী হৃষীকেশ চক্রবর্তীর পৌত্রী মিঠু চক্রবর্তী, বিপ্লবী দেবেশচন্দ্র কুণ্ডুর পৌত্র সুবীর কুমার কুণ্ডু, বিপ্লবী প্রফুল্ল কুমার সেনের কন্যা ড. পূরবী সেন, বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের প্রপৌত্রী রমা রায়, বিপ্লবী দেবকুমার ঘোষের কন্যা মিতালী সরকার, বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রবধূ মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. পবিত্র পাল, আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক ড. সৌমেন দাস এবং অংশুমান চক্রবর্তী, বিনয় শর্মা-সহ বহু বিশিষ্টজন। কার্যকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর দক্ষিণ-পূর্ব বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ উজ্জ্বল ঘোষ, দেশপ্রিয় ভাগ কার্যবাহ পবন কুমার, দেশপ্রিয় ভাগ শারীরিক প্রমুখ প্রশান্ত ঘোষ, দেশপ্রিয় ভাগ সদ্ভাবনা প্রমুখ চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় ভাগ প্রচার প্রমুখ সর্বদেব পালচৌধুরী, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর সভাপতি সুবীর রায়চৌধুরী এবং ক্রীড়াভারতীর কার্যকর্ত্রী জয়ন্তী মণ্ডল সরকার।

পূজনীয় মহারাজ উপনিষদ হতে বিভিন্ন শ্লোকের উদ্ধৃত করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনদর্শন ও উন্নত সমাজ চেতনার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উপস্থাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অন্য বক্তারা এ রাজ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার সার্বিক জাগরণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টির ওপর বিশেষ জোর দেন এবং এবারের বিধানসভা নির্বাচনে রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলকে এ রাজ্যের সর্বত্র জয়যুক্ত করার ব্যাপারে বিশিষ্টজনদের প্রতি আহ্বান জানান।

গত ২০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে ‘ন্যায় ব্রতী’-নামক একটি সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের ফল বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অমিত মুখোপাধ্যায়, শৈলেশ্বর ভট্টাচার্য, শুভাশিস পাত্র প্রমুখ। পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে প্লাস্টিকের পরিবর্তে কাগজের প্যাকেট ব্যবহার করা হয়।

কাটোয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরের ক্রমবিকাশ

সমীর কুমার চট্টোপাধ্যায়

কাটোয়া গৌরাঙ্গ পাড়ায় অবস্থিত শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির এবং মন্দির প্রাঙ্গণে অবস্থিত শ্রীপাদ কেশব ভারতীর আশ্রমই যুগে যুগে কাটোয়ার বিশেষ পরিচয় ভারতবাসীর কাছে এবং অধুনা কম্পিউটার যুগে বিশ্ববাসীর কাছে। একথা সর্বজনবিদিত যে, শচীর দুলাল নদীয়ার নিমাই ১৪০৭ শকাব্দ ফাল্গুনী পূর্ণিমা, ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে, ৮৯২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে ঘনবনে পরিপূর্ণ লোকালয় বিহীন ঘন বনে গঙ্গাতীরে সন্ন্যাসগুরু শ্রীপাদ কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষান্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণপূর্বক ভারতভূমিকে তদানীন্তন কালের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাভিচার, নানা রকমের কুসংস্কার হতে জীবকে উদ্ধার করার মানসে পদব্রজে কাটোয়া হতে বাহির হয়ে রাঢ়দেশ ভ্রমণ পূর্বক নীলাচলে যান। আর কোনোদিন কাটোয়ায় আসেননি। অমিয় নিমাই চরিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ২৮০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত যে, সন্ন্যাস গ্রহণকালে সমাগত ভক্তরা একটি স্তম্ভ নির্মাণ করে স্থানটিকে চিহ্নিত করে রাখেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দিরের ক্রমবিকাশ লিখতে গিয়ে প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হচ্ছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে যেমন সর্বজনগ্রাহ্য বই 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পাওয়া যায়, শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে এইরূপ কোনো বই পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবগ্রন্থাদি যথা চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল, মুরারি গুপ্তের কড়চা, স্বরূপ দামোদরের কড়চা ইত্যাদি বইতে সন্ন্যাস নেবার পর সন্ন্যাসভূমির সম্বন্ধে কোনো কিছুই উল্লেখ নেই। বহু প্রচারিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটিতেও স্থানীয় ইতিহাস কিছুই নেই। সহজবোধ্য কারণেই আমি, আমার পিতা, পিতামহ ও গৌরাঙ্গ মন্দিরের সেবাইতের নিকট শ্রুত ও প্রকাশিত নানা গ্রন্থের উপর নির্ভর করে এই প্রতিবেদনটি লিখছি।

শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, বিদ্যানন্দ পণ্ডিত নামে এক ব্যক্তি তদানীন্তন লোকালয় বিহীন বনমধ্যে এখন যেখানে পূর্বদুয়ারী মন্দির রয়েছে সেখানে একটি মাটির ঘর, হোগলা পাতার ছাউনি দ্বারা আচ্ছাদিত ঘরে (মন্দিরে) শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে অতি দীনহীন ভাবে কোনোক্রমে সেবা পূজা সূচনা করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহ শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি ঠাকুর কর্তৃক প্রাপ্ত হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ওই গ্রন্থের ১০৬-১০৯ পাতায় দেওয়া আছে। মহাপ্রভুর পরিকরদের মধ্যে দু'জন গদাধর পাওয়া যায়— একজন পণ্ডিত গদাধর, এর ভাগবত পাঠ শুনতে মহাপ্রভু খুবই ভালোবাসতেন। দ্বিতীয় জন দাস গদাধর প্রভু। মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থানকালে নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়বঙ্গে পাঠান তাঁর প্রেমধর্ম প্রচার করার জন্য। সঙ্গে দেন দাস গদাধর প্রভুকে যাঁকে নির্দেশ দেন মহাপ্রভুর জননী শচীমাতা এবং মহাপ্রভু ঘরনিকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে। দাস গদাধর প্রভু তারপরে নবদ্বীপে অবস্থান করে প্রেমধর্ম প্রচারের সঙ্গে মহাপ্রভু আদৃষ্ট কাজ করে থাকেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটে ১৪৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দে এবং একে একে শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ পার্ষদরাও অপ্রকট হন। প্রভু ঘরনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এরপরে অনেকদিন প্রকট থেকে ১৫৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে অপ্রকট হন। কিন্তু জগন্নাথ আলোয় থেকে দাস গদাধর প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অন্তর্ধানের পর শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন। তখন গদাধর প্রভু জানতেন যে সন্ন্যাস গ্রহণকালে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের নিদর্শন স্বরূপ মস্তক মুণ্ডনকালে কর্তিত কেশরাশি সংগৃহীত আছে এই সন্ন্যাসভূমিতে। তাই তিনি সোজা চলে আসেন এই সন্ন্যাসভূমিতে বিদ্যানন্দ পণ্ডিতের কাছে। আগেই বলা হয়েছে যে, বিদ্যানন্দ পণ্ডিত অতি দীনহীনভাবে সেবাকার্য পরিচালনা করেছিলেন।

আনুমানিক ১৫৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে এলেন দাস গদাধর প্রভু। বৈষ্ণবদের বিশাল উৎসব যা আজও খেতুরী বৈষ্ণব উৎসব নামে পরিচিত, সেখানে যোগদান করার মানসে নিত্যানন্দজায়া জাহ্নবী দেবী স্বপার্ষদ এই স্থানে আসেন মহাপ্রভু বিগ্রহ দর্শন করতে এবং বিদ্যানন্দ পণ্ডিতের সেবা নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হন। কিন্তু অত্যন্ত দৈন্যদশা দেখে ব্যথিত হয়ে তিনি আশীর্বাদ করেন যে কালে কালে গৌরভক্তরা আসবেন এবং তাঁদের দানে এই মন্দিরের উন্নতি সাধন হবে। দাস গদাধর প্রভু এই স্থানে আগমন পূর্বক ঠিক ঠিক যে স্থানে এখন গদাধর প্রভুর মন্দির রয়েছে সেই একই ভূমিখণ্ডে একটি ভজন কুঠি নির্মাণ করে নিয়ত গৌরাঙ্গ আরাধনায় ব্যাপৃত থাকেন। দাস গদাধর প্রভুকেই এই দেবালয়ের আদি প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়, যদিও তার কিছুকাল আগে থেকেই নিত্যসেবা সূচনা হয়েছে। দাস গদাধর প্রভু শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ পারিষদ ছিলেন। বাল্যকালে তাঁর পৈতৃক নিবাস বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার এড়িয়াদহ গ্রামে গঙ্গাতীরে ছিল। সেখানে তাঁর

শ্রীপাট বাড়ি আজও বিদ্যমান। এটা ঠিক উত্তরপাড়ার গঙ্গার অপর পাড়ে, খুবই দর্শনীয় জায়গা। গদাধর দাস বড়োই তেজস্বী গৌরভক্ত ছিলেন। দাস গদাধর প্রভু তাঁর অপ্রকট কালে তাঁর প্রিয় শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্তীকে এই দেবালয়ের নিত্য সেবার দায়দায়িত্ব দিয়ে ১৫৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে অপ্রকট হন।

'শ্রী যদুনন্দন চক্রবর্তী বিজ্ঞবর/যাঁর ইস্টদেব প্রভু দাস গদাধর।
কি বলিব কার্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী দিনে/মোর প্রভু অদর্শন হৈলা এইখনে'

(শ্রীশ্রী ভক্তি রত্নাকর, পৃষ্ঠা-৩৯২)

এই যদুনন্দন চক্রবর্তী বর্তমানের ৩৭-৩৮ ঘর সেবাইত পরিবারের আদি পুরুষ। দাস গদাধর প্রভুর অপ্রকট হওয়ায় এক বিশাল বৈষ্ণব উৎসব তথা গদাধর প্রভুর স্মরণে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় যদুনন্দন চক্রবর্তীর ব্যবস্থাপনায়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর তথা মহাপ্রভুর আরব্ধ প্রেমধর্ম প্রচারের আদেশপ্রাপ্ত শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু, যাঁর শ্রীপাট বাড়ি আজও বিদ্যমান যাজিগ্রামে। সমসাময়িককালে বৈষ্ণব সমাজে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা, নাটোরের রাজা, কাশিমবাজারের মহারাজা, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। যদুনন্দন চক্রবর্তীর ব্যবস্থাপনায় বছরে ৩৬৫ দিন সেবা পূজা চলতে থাকে। যদুনন্দন চক্রবর্তী বা চলতি কথায় যদুনন্দন ঠাকুর অপ্রকট হলে এই নিত্য সেবা পূজার ভার তাঁর তিনটি পুত্র— বড়ো পুত্র গৌরাঙ্গদাস, মধ্যমপুত্র কৃষ্ণদাস ও ছোটোপুত্র বৈষ্ণবদাসের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। যা আজও বড়োখুঁট, মধ্যমখুঁট ও ছোটোখুঁট নামে পরিচিত। এই বড়োখুঁটের বংশ তালিকা (শুধুমাত্র বড়োপুত্রদের নামে) এরূপ : গৌরাঙ্গদাস মধুরানাথ কৃষ্ণবল্লভ-রাধানাথ-কৃষ্ণচন্দ্র-পূর্ণানন্দ-নীলমণি-রাজীবলোচন-কৃষ্ণানন্দ-মার্কণ্ডেয় বেণীমাধব-গৌরহরি-নিত্যানন্দ-সদানন্দ-নন্দানন্দ। এই নন্দানন্দ ঠাকুরই বর্তমানে বয়োজ্যেষ্ঠ সেবাইত। ব্যক্তিগত জীবনে সরকারি কর্মচারী ছিলেন।

মধ্যমখুঁট অর্থাৎ কৃষ্ণাদাসের বংশধরও বর্তমানের সেবাইত শ্রীদুর্লভ গোস্বামী যাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেও বংশ তালিকা পাওয়া যায়নি। ছোটোখুঁট শ্রীবৈষ্ণবদাসের বংশের বর্তমানে কোনো পুত্রসন্তান না থাকায় শেষ বংশধর বামনদাস ঠাকুরের কন্যা মহাপ্রভুর সেবা অধিকার প্রাপ্ত হয়েছেন। বামনদাস ঠাকুরের কোনো পুরুষ কৃষ্ণলাল ঠাকুর ভাগবতের একজন বিখ্যাত কথক ছিলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে নিমন্ত্রিত হয়ে হরিবাসর করতেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ললিতমাধব ঠাকুরও ভগবত পাঠ করতেন এবং নবদ্বীপে টোল খুলে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং আনুমানিক ১৯২৫ সালে পরলোকগমন করেন। তারপরে পূর্বোক্ত বামন দাস ঠাকুর এই বংশের পক্ষে সেবা অধিকার প্রাপ্ত হয়ে অতি নিষ্ঠাসহকারে সেবা পূজা চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর আমলে এই দেব মন্দিরের প্রভূত সংস্কার সাধন হয়, যা মন্দির গাত্রে খোদিত প্রস্তর ফলকে উল্লিখিত রয়েছে। শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ আগে একটি সুন্দর কারুকার্য খোদিত পূর্ব দুয়ারী মন্দিরে অবস্থিত ছিল, কিন্তু বিগত ১৩০৪ বঙ্গাব্দের বঙ্গদেশ ব্যাপী ভয়াবহ ভূমিকম্পে ওই মন্দির-সহ অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তার পর বর্তমানে বিরাজমান পূর্বদুয়ারী মন্দিরটিও তৎসংলগ্ন নাটমন্দিরটি সংস্কারিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। কাটোয়া ডুবোপাড়া নিবাসী পরলোকগত শ্রীপরানচন্দ্র দাস একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি ধর্মানুরাগী ছিলেন। তিনি ১৩১৬ বঙ্গাব্দের বর্তমানে দৃশ্যমান অতি উত্তম কারুকার্য খচিত মন্দির প্রবেশে সিংহদ্বারটি নির্মাণ করে দিয়েছেন, যা একটি প্রস্তর ফলকে আজও দেখা যায়। দাস গদাধর প্রভুর মন্দিরটিও তখনকার কালে সংস্কারিত হয়েছে। বড়োখুঁটের বংশধর ঈশ্বর বেণীমাধব ঠাকুর একজন নিষ্ঠাবান সেবক ও শাস্ত্রজ্ঞানী ছিলেন। চারধামের তাঁর সমাধি আজও বিদ্যমান। তিনি যখন সেবাইত ছিলেন তখন শ্রীগৌর শিরোমণি যিনি সেকালে একজন বিখ্যাত ভগবত পাঠক ছিলেন এবং টোল চতুষ্পাঠী চালাইতেন, তিনি একদিন বহু ছাত্র সঙ্গে করে গঙ্গা স্নানে কাটোয়া আসেন এবং ঘটনাচক্রে শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরের প্রশস্ত নাটমন্দিরে আশ্রয় লয়েছিলেন। তিনি দেখলেন নাটমন্দিরে শ্রী বেণীমাধব ঠাকুর মালা হস্তে নামজপ করতে করতে এলেন এবং রাত্রিতে তাঁর হরিনাম-সংকীর্তনাদি দেখে গৌরশিরোমণি মন্ত্রমুগ্ধবৎ হয়েছিলেন। (শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা-৫৬)। গৌর শিরোমণি কাটোয়ায় অবস্থানকালে শ্রীগৌরাঙ্গের মঙ্গল আরতি দর্শন করে, প্রভাতি স্মরণ কীর্তন ও গঙ্গাস্নান করে জপধ্যান ও মহাপ্রভুর লীলা চিন্তনে দিন অতিবাহিত করতেন। তিনি শেষ জীবনে পাকাপাকি ভাবে বৃন্দাবনে বাস করতেন এবং ১২৯৭ বঙ্গাব্দে শ্রীবৃন্দাবনে দেহত্যাগ করেন। বৃন্দাবনে এখনো তাঁর ভজন কুঠী দেখা যায়।

বর্তমানে দর্শনার্থীরা মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনের সময় দেখেন, মধ্যে দণ্ডায়মান শ্রীগৌরাঙ্গের নবীন নটবর নদীয়ার নাগর মূর্তি। তাঁর ডানদিকে বংশীধারী ও নৃত্যের ভঙ্গিমায় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু, বামদিকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব। শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সূচনাকালে কিন্তু এরকম ছিল না। ছিল শুধুমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহ। তখনকার ভক্তদের মানসিকতার কথা চিন্তা করে গদাধর প্রভু এই বিগ্রহটি সংস্থাপিত করেন, যার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো যে কাটোয়ার সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ লীলা বিশেষ ভাবে জড়িত। কাটোয়ার ভ্রমণকালে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তদের মনে প্রথমেই সন্ন্যাসের সেই হৃদয়বিদারক চিত্র উদিত হয় এবং সেজন্য নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করতে হয়। কিন্তু সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গের নবীন-নটবর-নদীয়ানাগর মূর্তি দর্শন করে ভক্তদের মনোকষ্ট অনেকটা লাঘব হয়ে মনে শান্তি প্রদান করে। এভাবে প্রতিষ্ঠার সময় থেকে পরবর্তী ৩০০ বছর ছিল, পরবর্তীকালে শ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ ও জগন্নাথ বিগ্রহ সংযোজিত হয়েছে। শ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বংশ পরম্পরায় যা শুনেছি তা এই যে, এই দেব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নিত্য সাধু-সন্ন্যাসী বৈষ্ণব মহাত্মা ও সাধারণ ভক্তের আনাগোনায় এই স্থান মুখরিত হয়ে থাকত। তখন এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী এভাবে আসেন এবং ফেলে রেখে যান এই মূর্তিটি মন্দিরে, যা তখনকার সেবাইতরা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ শাঁখাই গ্রামের কোনো এক গৃহস্থের বাড়িতে গৃহদেবতা রূপে বিরাজ করত, কিন্তু মহাকালের প্রভাবে সংসার ছিন্ন হওয়ায় তারা অপারগ হয়ে এই দেবমন্দিরে দিয়ে যান।

এই দেবালয়ের প্রধান প্রবেশ পথে রয়েছে সিংহদরজা যা কাটোয়া শহর থেকে মন্দিরের প্রবেশের প্রধান পথ। প্রায় পঞ্চাশ ফুট

উচ্চতা, একতলায় রয়েছে ডানদিকে একটি ঘর, বামদিকে দ্বিতলে যাওয়ার সিঁড়ি, দ্বিতল ব্যবহৃত হয় নহবতখানা হিসেবে, ত্রিতলে রয়েছে বসা অবস্থায় পশুরাজ সিংহের মূর্তি। এই পথ দিয়ে প্রবেশ করে ডানদিকে রয়েছে প্রথম তুলসী মঞ্চ যা নির্মাণ করেন রাজুবালা দাসী কাটোয়া ডুবোপাড়া, সন- ১৩২২, ২৯ আষাঢ়। তার পাশে রয়েছে দাস গদাধরের সমাধি ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কেশের সমাধি। এই ঘরেই দাস গদাধর প্রভু বাস করতেন তিনি অপ্রকট হলে এইস্থানে সমাধি দেওয়া হয়। প্রাচীন সেবাইতদের মুখে শুনেছি যে মন্দির প্রতিষ্ঠার সূচনাকালে মন্দিরের একটি ধাতু পাত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কেশরাশি থাকতো ও নিত্যসেবা পূজা হতো, কিন্তু মন্দিরে আগত গৌরভক্তদের আকুতিতে তাঁর দর্শনকালে কেউ কেউ দু'একটি কেশ নিয়ে চলে যেত। তখন আদি সেবাইত দাস গদাধরের অপ্রকটের পর তাঁকে লম্বালম্বিভাবে শোয়ানো ওই পাত্রটি তাঁর ঠিক বুকের মধ্যিখানে রেখে সমাধিস্থ করেন। যা আমরা বর্তমানে কেশের সমাধি বলে উল্লেখ করি। ২৫/৩০ বছর আগে কাটোয়ায় প্রয়াত নন্দগোপাল ডাক্তারের পিসতুতো দাদা বহরমপুর কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত উকিল শ্রী কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই মন্দিরের মেঝে ও সমাধি মোজায়েক করে দেন। তারপরে রয়েছেন দ্বিতীয় তুলসীমঞ্চ যা কাটোয়া ডুবোপাড়া নিবাসী জনৈক ভক্তিমতী কর্তৃক ১৩০০ বঙ্গাব্দের ১৬ বৈশাখ নির্মিত হয়। গদাধর মন্দিরের ঠিক সামনেই রয়েছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণকালে মস্তক মুণ্ডনের স্থান। আর রয়েছে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষীদের বাণী ফ্রেমে বাঁধিয়ে সংস্থাপিত করা রয়েছে আগত গৌরবভক্তরা যাতে পড়তে পারেন। মস্তক মুণ্ডনের বাড়ি হতে বামপাশে রয়েছে সাত-আট ফুট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত শ্রীপাদ কেশবভারতীর বাড়ি, আদিকালে যা ছিল কেশবভারতীর আশ্রম। ওই আশ্রমের ভিতর রয়েছে কেশবভারতীর ভজনকুঠি, তাঁর অপ্রকটের পর এই ভজন কুঠিতেই তাঁকে পূর্ণ সমাধি দেওয়া হয়। এই সমাধি মন্দিরটি শ্বেতপাথর দ্বারা আচ্ছাদিত এবং সমাধি বেদিটি মোজাইক করা। সমাধি বেদিতে ১৯৯৪ সালে কেশবভারতীর একটি প্রতিকৃতিও বসানো হয়েছে। একটি প্রস্তরফলকে উল্লিখিত আছে যে, সেবাইত বামনদাস ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে শ্রীমতী মনোমোহিনী দাসীর সম্পূর্ণ অর্থ সাহায্যে ১৩৪২ বঙ্গাব্দে সংস্থাপিত হয়।

এই ভজন কুঠি থেকে তিন-চার ফুট দূরে আর একটি খোলা প্রকোষ্ঠের মাথায় লেখা আছে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রকাশের স্থান' অর্থাৎ এইখানেই সন্ন্যাস গ্রহণের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়েছিল বলে ভক্তজনেরা বিশ্বাস করেন। এর মধ্যে রয়েছে গুরু শিষ্যের চরণচিহ্ন ও সন্ন্যাস গ্রহণকালে ক্ষৌরকার মধু নাপিতের সমাধি। ১৪০১ বঙ্গাব্দে এখানে একটি কদমগাছ ও একটি বকুলগাছ রোপিত হইয়াছে, যাহা গৌরভক্তদিগকে খুবই আনন্দ দেয়। এই দুই প্রকোষ্টের মধ্যখানে রয়েছে বেণীমাধব ঠাকুরের সমাধি। ১৯৯৪ সালে এই মন্দিরে প্রভূত সংস্কারকার্য করা হয়। সাবেক ৩০ ইঞ্চি দেওয়াল অপসারিত করে ১০ ইঞ্চি দেওয়াল নির্মাণ করায় হরিনামের দলের খোল-করতাল বাজিয়ে মন্দির পরিক্রমা করতে সুবিধা হয়েছে। সন্ন্যাস গ্রহণের স্থানটি ১৩৪৪ সালে শ্রীমতী সুভাষিণী দাসী ও সরোজিনী দাসীর অর্থ সাহায্যে সংস্কার হয়। তত্ত্বাবধানে বামনদাস ঠাকুর। এই কাজে রাজমিস্ত্রি কাজ করেছিলেন বহরমপুরের সন্নিকট 'পাগড়ে ভাগডে' গ্রাম নিবাসী রাখাল মিস্ত্রি ও জ্যোতির্ময় মিস্ত্রি। ১৯৯৪ সালে এই মন্দির সংস্কার কার্যে আর্থিক সহায়তা করেছেন চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (মুখার্জি হার্ডওয়ার) ও আরও অনেকে। মন্দির অভ্যন্তরে এই স্থানগুলি আনুমানিক দু'-তিনশো বছর ব্যাপী একইরকম রয়েছে বংশানুক্রমে এইরূপ শুনেছি।

এরপর মূল মন্দিরে প্রবেশ করার সময় ছিল দ্বিতল দোল মন্দির ১৯৮০-৮১ সালে ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক সংস্কারকালে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়েছে, তাই আর বর্তমানে দৃশ্যমান নয়। এতে ছিল দোলমঞ্চ (দ্বিতলে) আর ছিল অর্ধবৃত্তাকার প্রবেশ পথ মূল মন্দিরে যাওয়ার জন্য যাকে এই স্থানীয়ভাবে 'ফোকড়' বলত। সেখানে বসে বৃদ্ধ সেবাইতরা হুঁকা হাতে আলাপ আলোচনা করতেন, সরস্বতী পূজা পালন করা হতো। এর ডানদিকে ছিল বৈষ্ণবখণ্ড সেখানে নানা উৎসবে ব্যবহৃত হতো। এরপর ছিল বিশাল কাঠের গেট ১৫-১৬ ফুট উচ্চ, তার মাথায় ছিল গণেশ মূর্তি। দু'দিক দিয়ে মূল মন্দিরে প্রবেশ করা যেত। কাঠের গেটের বাঁ দিকে ছিল একটি ছোটো খোলা প্রকোষ্ঠ যেখানে সেবাইত পরিবারের ছোটো ছেলেরা ঝুলন উৎসবে ঝুলন সাজাতো।

এরপরে একই সরলরেখায় রয়েছে নবনির্মিত ভোগমন্দির যা নির্মিত হয়েছে কাটোয়ার বিখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ী দেবনাথ পরিবারের অর্থানুকূল্যে বিগত ১৪০৫ বঙ্গাব্দে মন্দিরের নানা উৎসবের সময়। যখন প্রাচীন ভোগমন্দিরে সংকুলান হয় না তখন এই ভোগমন্দিরটি ব্যবহার করা হয়। এখানেই রয়েছে একটি প্রাচীন পাতকুয়া যেটি নির্মিত হয় হাওড়া নিবাসী শ্রীমতী দেবযানী দাসী ও জরৎকুমারী দাসীর অর্থানুকূল্যে ১৯৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে। এই ভোগমন্দিরের সামনে যে ফাঁকা জায়গা রয়োছে তার ঠিক মধ্যখানেও আগে একটি পাতকুয়া ছিল, যা ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে মন্দির সংস্কারকালে পাতকুয়াটি বুজিয়ে দেওয়া হয়। এই ভোগমন্দিরের বামদিকে রয়েছে আদি মন্দির যা পূর্বদুয়ারী মন্দির নামে আগেই উল্লেখ করেছি। এই মন্দিরে যেখানে এখন বিগ্রহ পূজা হচ্ছে তার বাম ও ডানদিকে একই আয়তনে দু'টি ঘর রয়েছে। ডানদিকের ঘরটিতে মন্দিরের যাবতীয় পুরোনো জিনিসপত্র রয়েছে, বামদিকের ঘরটিতে মন্দিরের পুরোহিত থাকতো এখন পুরোহিত নিজ বাসায় থাকায় ঘরটি খালি রয়েছে। এই ঘরেই রয়েছে ইলেকট্রিক মিটার। এই মন্দিরটি সমেত যুক্তবঙ্গের বহু মন্দির বিগত ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ৩০ জ্যৈষ্ঠ শনিবার এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৩০৮ বঙ্গাব্দে রাজশ্রী বনমালী রায়বাহাদুর এটা সংস্কার সাধন করেন। তাই মন্দিরের পশ্চিমদিকের দেওয়ালে দেখা যায় লেখা রয়েছে 'শ্রীশ্রী মহাপ্রভু জয়তু, ৫ ভাদ্র ১২৮৮ সন' অর্থাৎ ভূমিকম্পের আগে যে মন্দিরটি ছিল সেই একই দেওয়াল। মন্দিরের গাত্রে শ্বেতপাথরে খোদিত আছে 'নদেরচাঁদ সাহা ও তস্যপত্নী মনোমোহিনী দাসী সন ১৩৪২, ২ কার্তিক।' রাজুবালা দাসী ও তাঁর কন্যা চিত্তমোহিনী দাসীর সম্পূর্ণ অর্থ সাহায্যে মর্মর প্রস্তর দ্বারা এই মন্দিরের সৌধ বর্ধন হলো। পূরোহিত যে ঘরে থাকতেন ঠিক তার সামনে রয়েছে প্রাচীন ভোগমন্দির। ব্যবস্থা এমনই আছে যে, ভোগ রন্ধন হতে পুরোহিতের ঘরের মধ্য দিয়ে বিগ্রহের সামনে রাখা যায়,

সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে। প্রাচীন ভোগমন্দিরকে রসুইঘর বলা হয়। এই প্রাচীন ভোগমন্দিরে একটি ছোটো ও একটি বড়ো ঘর রয়েছে। বড়ো ঘরটিতে পর পর তিনটি উনুন রয়েছে। চাপ বেশি থাকলে বারান্দার উনুনটিও ব্যবহার করা হয়। এই বারান্দাতে রয়েছে একটি জলাধার যাতে মা ও বোনেরা নিত্য গঙ্গাস্নান সেরে ভিজে কাপড়ে গঙ্গাজল জমা করেন যা দিয়ে মহাপ্রভুর ভোগ রান্না করা হয়। বড়োই আনন্দ হয় যখন আমি প্রত্যক্ষ করি যে আপনার আমার বাড়ির মা-বোনের মতো কাটোয়ার হরিজন পল্লীর মা-বোনেরা, এমনকী শ্মশান চণ্ডালের স্ত্রীও এখানে গঙ্গাজল দেন এবং মন্দিরে বসে প্রসাদ তো খানই। সার্থক হয়েছে চৈতন্য ভাগবতে (১৬/২৩৮) এ উল্লিখিত শ্লোকটি— 'অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়/তথাপি সেই সে পূজ্য সর্বশাস্ত্রে কয়'। এবং (২৪/১০১)-এ উল্লেখিত শ্লোকটি— 'সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া/যে কৃষ্ণচরণ ভজে সে যায় তরিয়া।' এমনকী দু-একজন মুসলমানকেও মহাপ্রভু বিগ্রহ দর্শন করতে দেখেছি। এই ভোগমন্দিরের পূর্বদিকে রহিয়াছে দক্ষিণদুয়ারি মন্দির, যাতে ১৯৮০-৮১ সালে এক সুউচ্চ চূড়া নির্মিত হয়েছিল।

গত ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে এ মন্দিরের অনেক সংস্কার সাধন হয়েছে। রত্নবেদিটি মোজাইক টাইলস্ বসানো হয়েছে। পূর্বদুয়ারি মন্দিরের মতোই রসুইঘর থেকে যাতে মন্দিরে নির্বিঘ্নে ভোগ তোলা যায় তার ব্যবস্থা হয়েছে। এর সামনে রয়েছে কড়িবর্গার সুউচ্চ নাটমন্দির— চারটি নয় ইঞ্চি মোটা লোহার থাম আয়তাকার ক্ষেত্রের চারকোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদের উপর ভর করে রয়েছে কড়িবর্গার ছাদ। ঠিক যেমনটি রয়েছে মায়াপুরের আকর চৈতন্যমঠ। এটা নির্মিত হয়েছে ১৬ কার্তিক ১২১১ বঙ্গাব্দে। প্রাচীন সেবাইত গোবিন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের (প্রয়াত ডাঃ নন্দগোপাল চ্যাটার্জির বড়ো দাদা) কাছে শুনেছি এটা নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ নিবাসী দ্বারিক মোদক কর্তৃক নির্মিত অপরা সংস্কারিত হয়। এই মন্দিরে প্রতি বছর ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, আদি স্থাপয়িতা দাস গদাধর প্রভুর স্মরণ উৎসব, সন্ন্যাস উৎসব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে যথাযথ মর্যাদা সরকারে পালিত হয়। বাল্যকালে দেখেছি আরও উৎসব হতো, যথা রাসলীলা, নন্দ উৎসব, ৬৪ মহান্তের ভোগ প্রভৃতি। আগেই বলেছি আদি গৃহী সেবাইত যদুনন্দন ঠাকুরের বংশধররাই এই দেব মন্দিরের নিত্য সেবা পূজার দায়িত্বে বিগত প্রায় ৫০০ বছর ধরে রয়েছেন। এই মন্দিরের কোনো দেবত্ব সম্পত্তি নেই। মন্দিরে আগত গৌরভক্তদের দেয় ভিক্ষা ও সেবাইতদের ব্যক্তিগত অর্থানুকূল্যে এই সেবা চলছে, তবে পুরাকালে কাটোয়া শহরে ব্যবসায়ীরা প্রতি ১০০ টাকা মাল বিক্রির এক পয়সা বাধ্যতামূলক দেয় হিসেবে দিতেন যা উল্লেখিত আছে প্রাচীন গ্রন্থে (গৌর, গৌরবাড়ি, গৌরপাড়া, পৃষ্ঠা-১৭)। বর্তমান গৌরাঙ্গপাড়া ঢুকতে রাস্তার শেষ সীমানায় রয়েছে গৌরাঙ্গবাড়ি। (জেএল ২১, প্লট-১২৮৭, ২৩ শতক জায়গা) ঢুকতেই বামদিকে রয়েছে সৌদামিনী তীর্থনিবাস ১৯৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত।

প্রথমতলা নির্মাণ করেছেন কাটোয়ার অবসর প্রাপ্ত সরকারি অফিসার ধর্মদাস সাহা। দ্বিতল নির্মাণ করেছেন কাটোয়ার প্রয়াত ডাক্তার অহিভূষণ দত্ত। বৈদ্যুতিক কাজের ব্যয়ভার বহন করেছেন একজন গৌরভক্ত। এই দেব মন্দিরের কাজে যে গঙ্গার ঘাট ব্যবহৃত হতো তার বর্তমান নাম কালীবাড়ি ঘাট হলেও ১৯৪০-৪১ ক্রিস্টাব্দে এই ঘাটের নাম ছিল গৌরাঙ্গঘাট (কাটোয়া পৌরসভার রেকর্ড অনুযায়ী)।

মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস নেন অর্থাৎ ১৫১০ খ্রিস্টাব্দেও তৎপরবর্তী ১০০ বছরে এই ঘাটের নাম ছিল কেশবভারতী ঘাট যা উল্লেখিত আছে 'হরিভক্তি বিলাস নামক গ্রন্থের ত্রয়োদশ তরঙ্গে'। এখানে ছিল এক বিশাল বৈষ্ণবপাড়া ধর্মশালা, বামাশ্রয়, বড়ো প্রভুর আখড়া ও খেড়ুয়ার জমিদার নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক স্থাপিত কালীমন্দির। এই কালী মন্দিরের সামান্য অংশ ব্যতীত (১/৪ ভাগ) সমগ্র লোকালয়টি গঙ্গা ও অজয়ের সম্মিলিত বন্যায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আজ এই পরিণত বয়সে মহাপ্রভুর আঙিনায় সংঘটিত নানা ঘটনার কথা মনে উদয় হচ্ছে। দু'একটি প্রাচীন সেবাইতের কাছ থেকে শোনা।

যেমন প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এই দেব মন্দিরে এসেছিলেন ১০ ডিসেম্বর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সন্ধ্যায়। তিনি তখন তার জাতীয়তাবাদী মহিলাদের সভায় বক্তৃতা করেন। ১৯৩৩-৩৪ সালে এসেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পরে অনেকেই এসেছেন যথা— মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সেচমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. হুমায়ুন কবির। আমি নিজে দেখেছি ১৯৫৩-৫৪ সালে এসেছেন তখনকার নির্বাচিত সাংসদ নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লোকসভার স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা। তার সম্মানার্থে কীর্তন পরিবেশন করেছেন বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ সেবাইত শিবহরি গোস্বামী। পরে অনেকেই এসেছেন যেমন, মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরা, এসেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। আর লোকচক্ষুর আড়ালে কত যে সাধু মহাত্মা ও পুণ্যাত্মা এই দেবভূমিতে এসেছেন তার সন্ধান কে রাখেন। আর একটি ঘটনা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে, চিত্রমঞ্চের অভিনেত্রী মলিনাদেবী এবং অভিনেতা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছেন ১৯৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দে। না কোনো সুটিং সিনেমা করতে আসেননি এসেছেন একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সেবাইত পরিবারের কোনো কন্যার সঙ্গে কলকাতা পাইকপাড়া নিবাসী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপোর সঙ্গে বিবাহ উপলক্ষ্যে। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে কাটোয়া গৌরাঙ্গ পাড়ার মতো জায়গায় কাটোয়া পূর্বাঞ্চল সিনেমার বড়ো পর্দায় যাদের দেখা যায় তাদের চক্ষে দেখার জন্য মন্দির প্রাঙ্গণে এত ভিড় যে বিবাহ অনুষ্ঠান প্রায় পণ্ড হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

বর্তমান এই মন্দির নানা সমস্যায় জর্জরিত। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে অর্থের অভাবে মন্দিরের নানান সংস্কার কার্য করা যাচ্ছে না। পুরোহিতের মাহিনা, ইলেকট্রিক বিল ইত্যাদি প্রায় বাকি পড়ে যাচ্ছে। ২০০৪ সালের মে মাসে ভারতের নির্বাচন উপলক্ষ্যে পর্যবেক্ষক হিসেবে কাটোয়ায় এসেছিলেন মি. জৈন। কাজের ফাঁকে তিনি এই মন্দির দর্শন করতে আসেন। মি. জৈন উত্তরপ্রদেশের লোক। তিনি মন্দিরের এই অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দিতে যা বললেন তার অর্থ করলে দাঁড়ায় স্বয়ং ভগবানের মন্দিরের এই হাল আমরা উত্তরপ্রদেশের লোকেরা কল্পনা করতে পারি না। □

কবিগুরুর ভাবনায় 'হিন্দুত্ব'

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় একশো বছর আগেকার কথা। ১৯২৬ সাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর একবার ইওরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া শহরে এসে পৌঁছেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর স্মৃতি আর ইওরোপীয় দেশগুলির আত্মপরিচয় নির্ধারণের লড়াই সেখানকার সাধারণ মানুষের মনকে তখন উদ্ভ্রান্ত করে তুলেছে। এমন সময় তাদের মাঝে গুরুদেবের আবির্ভাব যেন দগ্ধ প্রাণে জল সিঞ্চনের কাজ করল। বিখ্যাত বুলগেরীয় কবি-সাংবাদিক ভ্লাদিমির ভিনতিলা ১৯৭৬ সালের ৭ আগস্ট মেনস্ট্রিম পত্রিকায় স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে এই ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। উদ্বিগ্ন সোফিয়াবাসী রবীন্দ্রনাথকে কাছে পেয়ে তাদের উদ্বেগের কথা জানালো নিঃসঙ্কোচে — এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কী? কবে মিটবে দেশ নির্ধারণের এই ক্লেশকর বিসংবাদ? রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত অথচ যুক্ত নির্ভর উত্তরে দ্বিধা পীড়িত ইওরোপবাসীর কাছে উন্মোচিত হলো এক নতুন দিগদর্শন। ভ্লাদিমিরের ভাষায়, "quoted old Hindu sentences and his favourite Hindu philosophers and poets inspired courage and bolstered up the spirits"— প্রাচীন হিন্দু দার্শনিক ও কবিদের উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ সোফিয়াবাসীকে সঞ্জীবিত করলেন।

আজ ভারতবর্ষে হিন্দু জাতীয়তার এক নব্য সংকলন মাথাচাড়া দেওয়ায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ উত্তেজানার সৃষ্টি হয়েছে। গুরুদেবের ১৬৫তম জন্মদিন উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে এই প্রসঙ্গে তার সমকালীন চিন্তাভাবনা কী ছিল তা একবার স্মরণ করা যাক।

বিশ্বকবি সোফিয়াবাসীকে হিন্দু দর্শনের নিদান শোনালেন কেন? আর সেই ভাবের মর্মস্থলে বিশেষ কী প্রেরণা ছিল যা দিশাহারা মনে একটা নির্ণয় প্রদর্শনে সমর্থ হলো? পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতার মূলে রয়েছে বৈচিত্র্যকে একটা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার প্রবণতা। ইওরোপ যখন রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিল আমাদের দেশ তখন সামাজিক ঐক্যকেই বড়ো বলে মনে করে। যে সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর সম্মেলনে ইওরোপ তার 'নেশন' গঠন করল তা মোটামুটিভাবে 'সবর্ণ'। তাই নেশন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে আপন-পরের বিভাজনটা আরও স্পষ্ট ও স্পর্শকাতর হয়ে উঠল। এইখানে রবীন্দ্রনাথ ইওরোপের সরকার-নির্ভর সমাজ এবং ভারতবর্ষীয় সমাজনির্ভর সমাজের মধ্যে প্রকৃতগত পার্থক্যের কথা বলেছেন ঃ 'হয় পরকে কাটিয়া মারিয়া খেলাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে নিজের বিধানকে সংযত করিয়া সুবিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান কবরিয়া দেওয়া, এই দুই রকম হইতে পার। য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে।' 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-শীর্ষক বঙ্গদর্শন (ভাদ্র ১৩০৯, জুলাই-আগস্ট ১৯০২) পত্রিকায় প্রকাশিত যে নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করলেন, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মনীতির মধ্যে যে মানসিক যোগ তা ভারতবর্ষের মতো করে আর কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। 'এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজ ব্যবস্থায় নয়, ধর্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের। য়ুরোপে রিলিজন বলিয়া যে শব্দ আছে ভারতবর্ষীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ অসম্ভব; কারণ ভারতবর্ষ ধর্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিতে বাধা দিয়াছে; আমাদের বুদ্ধি বিশ্বাস আচরণ, আমাদের ইহকাল পরকাল, সমস্ত জড়াইয়া ধর্ম। ভারতবর্ষ তাহাকে খণ্ডিত করিয়া কোনটাকে পোশাকি এবং কোনটাকে আটপৌরে করিয়া রাখে নাই। হাতের জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়; বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয়দিনের ধর্ম, এবং গৃহের ধর্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই...।'

আপন-পরের মধ্যে যে মানসিক বিচ্ছদে তা দেশের অন্তর্নিহিত ভেদ-বুদ্ধিকে প্রশমিত করলেও পরদেশের অসবর্ণ জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বিষোদ্গার করতে ছাড়তে না। কিন্তু হিন্দু সভ্যতা মূলত অসবর্ণ জাতিগোষ্ঠীর সংহতি হওয়াতে একটা ইনক্লুসিভ ধর্মনৈতিক ঐক্যবোধের সমস্ত বৈচিত্র্যকে স্বীকার করেও এক সুরে বেঁধেছে। স্বভাবতই অন্য জাতি বা পরজাতি সম্বন্ধে কোনো বৈর উৎপাদনের সম্ভাবনা হিন্দুদের শাস্ত্র বা সমাজে কোনো মতেই মজ্জাগত নয়। ভারতীয় সভ্যতাও তার ঊষালগ্নে একাধিক জাতি ও গোষ্ঠীর নিরন্তর সংঘাতে উৎখাত হয়েছিল। মাইরন এইচ ফেলপ্স নামক এক আমেরিকাবাসী আইনজীবীকে লেখা চিঠিতে (৪ জানুয়ারি ১৯০৯) রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'আমাদের সভ্যতার জন্মলগ্নের সেই বিরোধ মিটিয়ে ভারতীয় সভ্যতাকে ঐক্য ও সহনশীলতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন দুই মহাপুরুষ, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ। ফলত, হিন্দু সভ্যতা সংগঠিত করেছে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন শক জাতীয় জাঠ ও রাজপুত, মিশ্রজাতীয় নেপালী, আসামী, রাজবংশী, দ্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী, নায়ার সকল আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দু সমাজের মধ্যে একটা বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিতেছে। হিন্দু সভ্যতা এত বিচিত্র লোককে আশ্রয় দিতে গিয়া নিজেকে নানাপ্রকারে বঞ্চিত করিয়াছে। কিন্তু তবু কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই; উচ্চ-নীচ, সবর্ণ-অসবর্ণ, সকলকেই ঘনিষ্ঠ করিয়া বাঁধিয়াছে। সকলকে ধর্মের আশ্রয় দিয়াছে, সকলকে কর্তব্যপথে সংযত

করিয়া শৈথিল্য ও অধঃপতন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথের এই শেষোক্ত মন্তব্যটি যে প্রবন্ধের অন্তর্গত সেটি আজ 'আত্মশক্তি' নামক সংকলনে 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' নামান্তরে প্রচারিত হলেও উল্লেখখ্যোগ্যভাবে এর প্রথম আত্মপ্রকাশ 'হিন্দুত্ব' নামাঙ্কিত নিবন্ধ রূপে, বঙ্গদর্শন পত্রিকা ১৩০৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায়। গুরুদেব এক সজীব হিন্দু নেশনের কথা ভেবেছেন, যেখানে 'নেশনের প্রত্যেকে ন্যাশনাল স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া থাকে।' যে ধর্ম ও কর্তব্যের পথ অনুসরণ করে হিন্দু সমাজ তার হৃত সজীবতা পুনরুদ্ধার করতে পারবে তা আদপে 'ন্যাশনাল স্বার্থরক্ষার সহায়ক পন্থা।' গুরুদেবের মতে এই হচ্ছে হিন্দুত্বের প্রকৃত আদর্শ — 'সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান ও অন্নদান, ধনসম্পদ-দান, ইহা আমাদের নিজের কর্ম; ইহাতেই আমাদের মঙ্গল; ইহাকে বাণিজ্য হিসাবে দেখা নহে, ইহার বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা না করা, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত কর্মযোগ। এই কথা নিয়ত স্মরণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব। স্বার্থের আদর্শকেই মানবসমাজের কেন্দ্রস্থলে না স্থাপন করিয়া, ব্রহ্মের মধ্যে মানবসমাজকে নিরীক্ষণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব।'

হিন্দুত্বের এই উদার মার্মিক বর্ণনা যেমন গীতাশ্রয়ী তিনটি যোগের ওপর নির্ভরশীল, তেমনি হিন্দু ঋষিদের তপস্যালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। ঈশ্বরের মধ্যে সমগ্র মানবসমাজকে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা সর্বসমাবেশক হিন্দু সমাজকে তার দুষ্প্রাপ্য সহিষ্ণুতা দান করেছে। ১৯১৭ সালে আমেরিকায় প্রদত্ত 'ন্যাশনালিজম্ ইন ইন্ডিয়া'-শীর্ষক ভাষণে গুরুদেব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, হিন্দু সমাজ তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে এমন এক উচ্চতর নৈতিক আদর্শে ('higher moral power') উপনীত হয়েছে যার দ্বারা মানুষ তার অভ্যন্তরীণ পাশবিক প্রবৃত্তি দমন করতে পারে; যে প্রবৃত্তি অসংযত অবস্থায় মানুষকে শুধুমাত্র স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে উত্তেজিত করে।

এখানে রবীন্দ্রনাথ মনস্তাত্ত্বিক সিগমুন্ড ফ্রয়েডের সঙ্গে একমত। মানুষের মধ্যে নিহিত মনুষ্যেতর হিংস্র প্রবৃত্তিগুলি দমন ও ঊর্ধ্বপাতনের ক্ষেত্রে অধ্যাত্মভিত্তিক প্রাচ্য দর্শনের উপযোগিতা ফ্রয়েড বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। মানুষের চারিত্রিক বিকার রোধে প্রাচ্য দর্শনের ভূমিকা মর্ডানিস্ট পশ্চিমি প্রকরণ তখন সবেমাত্র আমল দিতে আরম্ভ করছে, ইওরোপের নতুন প্রজন্মের কাছে তখনও সে জ্ঞান অধরা। তাই ১৯২৬-এ সোফিয়াবাসীর কাছে গুরুদেবের উদ্দীপক বিশ্লেষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে দেশের মাটিতে জাতীয়তাবাদী চেতনা উন্মেষের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ এসব আলোচনা অনেক আগে থেকেই করে আসছিলেন।

ভারতবর্ষীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি কলকাতার মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে ৭ শ্রাবণ ১৩১১ (১৯০৪) বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশন যা উল্লেখ করলেন তা প্রথম যুদ্ধোত্তর ইওরোপবাসীর উদ্বেল হৃদয়ের লক্ষ্যেও উদ্দিষ্ট ঃ ''ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই... ভারতবর্ষ সৈন্য ও পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদবেজিত করিয়া ফিরে নাই; সর্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্তিত্বের চেয়ে বড়ো।'' আপন-পরের পার্থক্যকে 'বিরোধ' মনে না করে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির সহাবস্থানের উপযোগী ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ। মিনার্ভা থিয়েটারের ওই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট ইঙ্গিতি দিলেন ঃ 'হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিস্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না; এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না। তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশ-বিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।' ভারতবর্ষের প্রাণ যে হিন্দুত্ব তার উদার সংজ্ঞা গুরুদেব আগেই দিয়েছেন। তবে 'হিন্দুয়ানির গোঁড়ামি যে আমার পক্ষে মৃত্যু' সে কথাও আমাদের স্মরণ করে দিতে গুরুদেব ভোলেননি। ভারতী পত্রিকার ১৩০৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় তিনি হিন্দু জাতির দুর্বলতার জন্যে এই গোঁড়ামিকে দায়ী করেছেন ঃ ''যদিচ আমরা বহুসংখ্যক, তথাপি আমরা বল পাই নাই।'' এই সময় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে আর্যসমাজ যে বেদভিত্তিক হিন্দুধর্মের পুনর্জাজগরণ ও কুপ্রথা দূর করতে অগ্রণী হয়েছিলেন, গুরুদেব তাতে আশান্বিত হন। ''এক্ষণে যিনি জড়ীভূত হিন্দুজাতির মধ্যে আচারে ব্যবহারে সমাজে ধর্ম আর্যভাবের একটি বিশুদ্ধ আদর্শ স্থাপন এবং কৃত্রিম ক্ষুদ্র নিরর্থক বিচ্ছেদগুলি দূর করিয়া সমগ্র লোকস্তূপের মধ্যে একটি সজীব ঐক্য সঞ্চার করিয়া দিবেন তিনিই ভারতবর্ষের বর্তমান কালের মহাপুরুষ।''

সামাজিক সংস্কারধর্মী দুর্বলতা থেকে মুক্ত হলেও হিন্দু জাতীয়তাবোধে কোনোদিনও সেরকমভাবে পলিটিকাল মাত্রা সংযোজিত হয়নি, অন্তত ইংরেজ শাসনকালে তো নয়। 'ইংরেজ আতঙ্ক'-শীর্ষক রচনায় (সাধনা পত্রিকা, পৌষ, ১৩০০ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথ হিন্দুদের এই দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন ঃ 'কিন্তু এতদিনে ইংরাজ এ কথা কতকটা বুঝিয়া থাকিবে যে, হিন্দুর হস্তে পলিটিক্স তেমন মারাত্মক নহে। আবহমান কালের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষ পলিটিকাল ঐক্যের কোনো লক্ষণ কোনোকালে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐক্য কাহাকে বলে মুসলমান তাহা জানে এবং পলিটিক্সও তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে; মুসলমান যদি দূরে থাকে তবে কংগ্রেসের হইতে আশু আশঙ্কার কোন কারণ নাই।'' জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নিরিখে 'হিন্দুদিগের এই পলিটিকাল দুর্বলতা সমকালীন ভারতবর্ষে একটা আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। সুসমঞ্জস 'হিন্দু' ভারতবর্ষের যজ্ঞের স্বপ্ন গুরুদেব দেখেছিলেন, আজ স্বাধীনতার আটাত্তর বছর পর কি আমরা তার সার্থকতার খতিয়ান বুঝতে প্রস্তুত?

(লেখক অধ্যক্ষ, রবীন্দ্রভবন বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন)

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

তোষণনীতির যূপকাষ্ঠে ‘বন্দে মাতরম্’

দেবল চক্রবর্তী

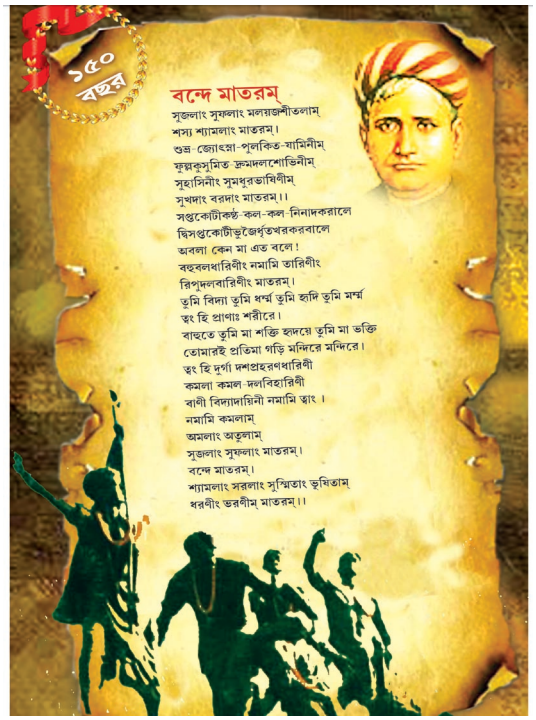

জনসমুদ্র যেন। জনরোষের ঢেউ। মিছিলটা এগিয়ে আসছে তমলুক পুলিশ স্টেশনের দিকে। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪২, মেদিনীপুর। উত্তাল জনজোয়ারে মুহুর্মুহু মাতৃবন্দনা শোনা যাচ্ছে—

—বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্,

—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম

ব্রিটিশ সরকার বাহাদুরকে তিন তিনটে গুলি খরচ করতে হলো এক ৭২ বছরের বৃদ্ধাকে মারার জন্য। প্রথম গুলিতে তাঁর ডানহাতে থাকা শঙ্খ পড়ে গেল, দ্বিতীয় গুলিতে বামহাতে থাকা জাতীয় পতাকা মাটিতে লুটোচ্ছে। তাতেও নিশ্চিন্ত নয় গোরা পুলিশের দল। তৃতীয়টা একেবারে কপালে। লুটিয়ে পড়তে পড়তেও শোনা গেল সেই অগ্নিমন্ত্র

... বন্দে মাতরম্।

তিনি মাতঙ্গিনী হাজরা। শুধু তিনি নন। মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে সেই অগ্নিযুগের সব অগ্নিপুরুষ আর অগ্নিকন্যাদের মুখেই শোনা গেছে বিপ্লবের এই অগ্নিমন্ত্র। মদনলাল ধিংড়া, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু মাস্টারদা সূর্য সেন এমন বহু বিপ্লবীর ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে শেষ উচ্চারণ ছিল— ‘বন্দে মাতরম্’। এই মন্ত্রোচ্চারণের ফলে ভারতীয়দের মনোবল দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে যায় ইংরেজ শাসক। ফলে ‘বন্দে মাতরম্’ নিষিদ্ধ করা হয়। ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্য রচয়িতা ঋষি বঙ্কিম নিজেই করে গিয়েছিলেন,

—এই গানই একদিন ভারতবাসীর রক্তে আগুন ধরিয়ে দেবে।

শুধুমাত্র এই ধ্বনি দেওয়ার অপরাধে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ শাসক। ঋষি-প্রদত্ত এমন শব্দবন্ধ একটা জাতির কপালে জোটে হয়তো কয়েক শতকে একবারই।

এই মন্ত্রের রচয়িতাকে কম বিড়ম্বনাতে পড়তে হয়নি। শুধুমাত্র এই মন্ত্র সৃষ্টির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে একবারের জন্যও পদোন্নতি দেওয়া হয়নি। অথচ তখন তিনি রীতিমত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। বিড়ম্বনা এতটাই গভীর ছিল যে তিনি চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

এহেন ‘বন্দে মাতরম্’-এর আজ সার্ধশতবর্ষ। ১৮৭৫ সালে এর জন্ম, আর আজ ২০২৬। গাণিতিক ভাবে সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন, ঠিকই আছে। কিন্তু ওটা নেহাতই ক্রোনোলজিক্যাল। ১৮৭৫ সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় পাতা ভরাট করে এই ২৬ পঙ্‌ক্তির বন্দনাগীতিটা যখন ছাপা হলো, তখন কারোরই তেমন নজরে পড়েনি। নজরে পড়ল বছর সাতেক বাদে, যখন ভবানন্দের মুখে শোনা গেল এই ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি। ভবানন্দ মানে আনন্দমঠের সন্তানদের অন্যতম, আনন্দমঠ উপন্যাসের অন্যতম প্রোটাগোনিস্ট।

আসলে ‘বন্দে মাতরম্’ যদি কন্টেন্ট হয়, তবে কন্টেনারের নাম নিশ্চিত ভাবে আনন্দমঠ। তাই ‘বন্দে মাতরম্’ মনে করতে গেলে আনন্দমঠকে মনে করতেই হবে। সোজা কথায় আনন্দমঠ একটা ফিকশনাল স্টোরি। যেমনটা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সেই সময়’। ‘সেই সময়’ উপন্যাসে ‘নবীন কুমার’ নামের আড়ালে আসলে কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবন বৃত্তান্ত বলা হয়েছে, অথচ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বা মাইকেল মধুসূদনের মতো ঐতিহাসিক চরিত্ররা তাঁদের টাইম লাইন মেনেই ওই উপন্যাসে উপস্থিত ছিলেন। এই আনন্দমঠও তাই। ‘সন্ন্যাসী বিদ্রোহ’ আর ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’-এর মতো হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট দুটো এই উপন্যাসে তাদের সকল টাইম লাইন আর রিয়েলিটি নিয়ে বিদ্যমান।

ব্রিটিশদের বঙ্গপ্রদেশে পা রাখা অর্থাৎ ১৭৫৭ সাল আর চলে যাওয়া অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল— এই প্রায় দু’শো বছরের (১৯০ বছর) ইতিহাস যে সেটা আগে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। তার নাম মহাবিদ্রোহ। ঘটে ঠিক ১৭৫৭ আর ১৯৪৭ সালের মাঝখানে, অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে। বীর সাভারকর এটাকে ভারতের স্বাধীনতার মহাসংগ্রাম বলেছেন। মহাসংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ-টা জ্বলেছে ১৮৫৭ সালে, কিন্তু এর সলতে পাকানো চলেছে বহুদিন থেকে, সাঁওতাল বিদ্রোহ, কুকা বিদ্রোহ (Kuka Revolution) -এর মধ্যে দিয়ে। এদেরই অন্যতম সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০) খ্রিস্টাব্দ।

একটা ভালো সংখ্যক সন্ন্যাসী বছরের কোনো এক সময় উত্তর ভারত থেকে এই বঙ্গভূমির নানান মন্দির দর্শনে আসতেন। ধর্মপ্রাণ জমিদার, মোড়লরা এহেন সাধুদের প্রণামি দিতেন স্থাবর, অস্থাবর সম্পদের মাধ্যমে।

ওদিকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে এসেই

নানান জায়গায় কিছু মুরুব্বি গোছের লোককে লাগিয়ে দিয়েছে স্থানীয় মানুষের থেকে কর আদায়ের জন্য। বঙ্গের যেমন সে সময় কর আদায়ের দায়িত্ব ছিল মহম্মদ রেজা খাঁ-র ওপর। ১১৭৪ সাল ও ১১৭৫ সালে ভালো ফলন হয়নি বঙ্গপ্রদেশে অনাবৃষ্টির কারণে। তার উপর রেজা খাঁ-র অত্যাচারে বঙ্গের মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। সময়টা ১৭৭০ সাল (বঙ্গাব্দ ১১৭৬), বঙ্গের ঘরে ঘরে অনাহার, মৃত্যু। বঙ্গ যেন এক আদিগন্ত বিস্তৃত শ্মশানের নাম। ইতিহাস একে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলে জানে। একদিকে যখন এই অবস্থা, তখন জমিদার বা বর্ধিষ্ণু মানুষজনেরা সন্ন্যাসীদের টাকা, পয়সা, খাদ্যশস্য, ফল-ফলাদি এইসব দিচ্ছে প্রণামি হিসেবে, এটা ব্রিটিশ সরকার ভালো চোখে দেখেনি। তাদের ধারণা ছিল, এই অর্ধনগ্ন ফকিরগুলোকে দেশীয় জমিদাররা এসব প্রণামি না দিলে আমরা আরও বেশি কর পেতাম।

অতএব এই সন্ন্যাসীদের খতম করো। একসঙ্গে ১৫০ সন্ন্যাসীকে হত্যা করেছিল ওই রেজা খাঁ। আরও ভালো করে বললে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওরফে রেজা খাঁ। সন্ন্যাসীরা কিন্তু লড়াই না করে জমি ছেড়ে দেয়নি। এই লড়াইকেই ইতিহাস 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' বলে জানে। বক্সারের পণ্ডিত ভবানীচরণ পাঠক নামে এক সন্ন্যাসী এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন বলে শোনা যায়। একথা বোঝা দরকার যে, এই আন্দোলন ছিল সন্ন্যাসীদের এই রেজা খাঁ ওরফে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই। কিন্তু কখনই মুসলমান বা খ্রিস্টানদের সাথে লড়াই নয়। এ শুধুই অমানবিক একনায়কদের বিরুদ্ধে লড়াই। আনন্দমঠের যে দুটো মেজর ব্যাক ডোর এর ওপর দাঁড়িয়ে অর্থাৎ 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' আর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, আগে দুটোই একই সময় বঙ্গের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে।

ঋষি বঙ্কিম তার এক সন্ন্যাসী চরিত্র ভবানন্দের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন— 'আমরা অন্য মা জানি না। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী। আমাদের মা নেই, বাপ নেই ,ঘর নেই, বাড়ি নেই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলাং সুফলাং, মলয়জশীতলাম শস্যশামলাং।'

এতটা দেশাত্মবোধ আছে বলেই এই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটির এতো জোর।

এতো গেল 'বন্দে মাতরম্' এর জন্ম বৃত্তান্ত। কিন্তু প্রশ্ন হলো এতটা ক্ষমতা সম্পন্ন শব্দকে নিয়ে আসেন পরবর্তী কারণে, বিশেষত স্বাধীনতা উত্তর যুগে। তখন রাজনৈতিক নেতা আর আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কী করলেন এটা নিয়ে?

ঘটনাক্রমটা এমনতর ঃ

১৮৯৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পাওয়া হয় এ গান। পরিবেশন করেছিলেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরবর্তী কালে ১৯০১ সালে ও ১৯০৫ সালের বারাণসী অধিবেশনে এই গান পাওয়া হয়। ১৯০৭ সালে মাদাম কামা ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকার রূপদান করেন। তার মাঝের ব্যান্ডে দেবনাগরী হরফে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিটি খোদিত ছিল।

মুসলিম লিগ এই গানটি গাইতে অস্বীকার করলে শুরু হয় বিস্তর বিতর্ক, বিবাদ। এই শুরু হল 'বন্দে মাতরম্ বিতর্ক'। এই গানে দেশমাতৃকাকে মা দুর্গা হিসেবে বন্দনা করাতেই স্বাধীনতার আগে থেকেই একে জাতীয় সঙ্গীত করা নিয়ে আপত্তি চাগিয়ে তোলে মুসলিম লিগ।

১৯৩৭ সাল। ভারতের স্বাধীনতা দরজায় টোকা মারছে। মানুষজন তার গন্ধ পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কলকাতায় শুরু হলো সমস্যা। 'বন্দে মাতরম্' না 'জনগণমন', কোনটা হবে জাতীয় সঙ্গীত? স্বাধীনতা আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম্'-এর অবদান অনস্বীকার্য, এদিকে জওহরলাল নেহরু নেতৃত্বাধীন ব্রিগেডের মতে— জনগনমন-তে সমগ্র ভারতের একটা ছবি ফুটে উঠেছে। যেখানে জাতি-ধর্ম অঞ্চলের ভেদ নেই। মুসলমান তোষণকারী নেহরুর মত হলো— 'বিবিধতার মধ্যে ঐক্য', 'সর্বধর্ম সমভাব'-নামক শব্দগুলো অন্তরায় হয়ে পড়ছে 'বন্দে মাতরম্'-এর জাতীয় সঙ্গীত হবার পথে।

জওহরলাল ছুটলেন বঙ্গ তথা ভারতবর্ষ, তথা পৃথিবীর অন্যতম চিন্তাবিদের কাছে। তিনি রবিঠাকুর। এক দীর্ঘপত্রে নিজের বক্তব্য জানালেন তিনি জওহরলালকে যে, স্বাধীনতার মঞ্চে 'বন্দে মাতরম্'-এর অবদান, বিপ্লবী মন্ত্র হিসাবে একে অস্বীকার করা যাবে না কখনই। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে এই গানটিই আদর্শ। তবে কংগ্রেস নেতৃত্বের মতানুযায়ী, 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম দু'টি স্তবক ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হতে পারে। তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রবলভাবে কবিগুরুর মতকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হওয়ার কারণে পরে সুভাষচন্দ্রকে চিঠি লিখে এই বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেন গুরুদেব। সর্ব ধর্মের মিলন মঞ্চ এই দেশ আর বঙ্কিমচন্দ্রের ওই রচনা এই খণ্ডিত গানে কোনোভাবেই সেই ছবিটাকে তুলে ধরছে না।

১৯৩৭ সালেই সুভাষচন্দ্র বসুকে লেখা একটি চিঠিতে এই কথা বললেন রবিঠাকুর—

'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম অংশটি সুন্দর, একটি কোমল মধুর ভাবের উদ্রেক হয় ভারতমাতার জন্য, সেটি জাতীয় সমাবেশে গাওয়ার উপযোগী।

উপন্যাসের শুরুতে সত্যানন্দ ঠাকুর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন সবার সঙ্গে,

'মা— যা ছিলেন। মা যা হইয়াছেন? মা যা হইবেন।'

এ উপন্যাসে সন্তানেরা বলছে

—আমার দেশই আমার মা।

এমন স্বদেশী ভাবনার উপন্যাসে এমন দুর্গাস্তব তো থাকবেই। 'বন্দে মাতরম্' তো এই আনন্দমঠেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১৯৫০ সালে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে জনসমক্ষে যে বেছে নেওয়া হলো। সেটুকু শিরোধার্য। তাতে কারোর খেদ নেই। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা আর সর্বধর্ম সমন্বয়ের তোষণনীতিতে খানিক হলেও আড়াল হলো বন্দে মাতরম্। তোষণনীতির যূপকাষ্ঠে বলি হলো বন্দে মাতরম্। □

ভারতীয় চলচিত্রে নয়া ইতিহাস গড়ল ‘ধুরন্ধর’

মনোজিৎ সরকার

“এটা নতুন ভারত, আতঙ্কবাদীদের ঘরে ঢুকে বদলা নেবে”

“ যো ঘায়েল হ্যায় উও ঘাতক হ্যায়!”

ডিসেম্বর ২৪, ১৯৯৯। ভারতীয় বিমান কান্দাহারে আটক করল পাক-মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা। হরকত-উল-মুজাহিদিনের পাঁচ সন্ত্রাসবাদী প্রায় সাতদিন আটক করে রেখেছিল। সব শর্ত মেনে সেদিন ভারতের পক্ষ থেকে অজিত দোভাল সাহেব যখন পৌঁছেছিলেন, সন্ত্রাসবাদীদের এক জহুর মিস্ত্রি সেই সময়ে তাঁর সামনে ‘ভারতমাতা কী জয়’ বলা বন্ধ করে দিয়েছিল। বন্দুক উঁচিয়ে বলেছিল ‘হিন্দু ডরপুক কউম হ্যায়’। তারপর গঙ্গা-সিন্ধু দিয়ে বহু জল গড়িয়েছে। কেন্দ্রে এসেছে জাতীয়তাবাদী সরকার। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই মিস্ত্রি তেমন এক গানপয়েন্টে তার নিজের দেশে প্রাণভয়ে বলল— ‘ভারতমাতা কী জয়’।

আদিত্য ধর পরিচালিত ‘ধুরন্ধর’ ছবিটি এই সময়ে আকাশে বাতাসে ধ্বনিত করেছে ভারতের সনাতন আত্মাকে। দেশ বিদেশে এই হাই ভোল্টেজ স্পাই থ্রিলার যা RAW-এর ফিল্ড অফিসার বা এজেন্টদের পাকিস্তানে গোপন অভিযানের এক বাস্তব ঘটনার আখ্যান। ‘হামজা আলি মাজারি’ নাম ও পরিচয়-সহ আন্ডার কভার র’ এজেন্ট হিসেবে একজন করাচির লিয়ারি এলাকার আন্ডার ওয়ার্ল্ডে প্রবেশ করেন। উদ্দেশ্য আইএসআই এবং সন্ত্রাসবাদীদের যোগসাজশ ধ্বংস করা।

সিনেমাটি দু’টি ভাগে বিভক্ত। ‘ধুরন্ধর’ প্রথম পর্ব ২০২৫ সালে মুক্তি পায় বিশ্ব জুড়ে। শুরুতেই ধামাকা। গোটা বিশ্বে ‘স্পাই থ্রিলার’ ও ‘অ্যাকশন-থ্রিলার’ ছবি হিসেবে সব শ্রেণীর দর্শকদের কাছে ভারতের এই ছবি সমাদৃত হয়। দ্বিতীয় পর্ব ‘ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ’ চলতি ২০২৬ এ মুক্তি পায়। এই লেখা প্রকাশ অবধি প্রায় ১৮০০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে ।

উল্লেখ্য পরিচালক আদিত্য ধরের আগে ‘উরি’, ‘আর্টিকল্ ৩৭০’-এর মতো ছবি করে ভারতীয় দর্শকদের মন কেড়ে নিয়েছিলেন। তবে ‘ধুরন্ধর’ সব ছবিকে টেক্কা দিয়েছে। দেশবিরোধীদের অনেকের অভিযোগ এটি জাতীয়তাবাদী প্রোপাগান্ডা মুভি। কিন্তু বৃহত্তর দর্শককুলের বক্তব্য, এটি একটি অত্যন্ত সাহসী অ্যাকশন-প্যাকড্ সত্য ঘটনার না বলা গল্প। যা দীর্ঘ গবেষণালব্ধ। এবং তা নিসন্দেহে ভারতীয় সিনেমার এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। দর্শকমহলে এমনও চর্চা চলছে, ভারতে ফিল্মের প্রচলিত খান ভাইদের রমরমা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে আদিত্য ধরের এই অসাধারণ আখ্যান।

কিন্তু কেন এত রমরমা এই ছবিকে ঘিরে?

সার্জিকাল স্ট্রাইক কেন? কোন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে সরকারকে নোট বাতিল করতে হয়েছিল? নোট বাতিল না হলে কী কী অনর্থ হতো? কোন পথ দিয়ে ষাট হাজার কোটি টাকার জাল নোট ছাপিয়ে দেশে ঢোকায় আইএসআই? দাউদ কোথায় আছে? পাক ইসলামি সরকারের আসল রূপ ঠিক কতটা ভয়ঙ্কর! ভারত-বিরোধী শক্তি কীভাবে এই দেশে থেকে পাকিস্তানকে সাহায্য করছে! বালোচিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের অবস্থান কোন জায়গায় অবস্থিত। এমন না বলা, অজানা তথ্যে জমজমাট থ্রিলার ‘ধুরন্ধর-১ ও ২’। টানটান উত্তেজনা, লিয়ারি, করাচির বাস্তব চিত্র, বালোচিস্তানের মরুবাসী মানুষদের করুণ অবস্থা। সিনেমা জুড়ে চোখে পড়ে এসবেরই অনুপুঙ্খ ডিটেলিং। যা না দেখলে ফিল্ম-প্রেমী ভারতীয়দের আপশোস থেকেই যাবে।

এ সবের সঙ্গে চরিত্রাভিনেতাদের অসাধারণ অভিনয়। হামজা আলি মাজারির চরিত্রে রণবীর সিংহ এক ‘নতুন শোলে’ রচনা করেছেন। গোটা দেশের ফিল্ম পিপাসুরা মজে রয়েছেন তাঁর অভিনয়ে। জামিল জামালির চরিত্রে রাকেশ বেদী-বা কম কীসে। রেহেমান ডাকাইতের চরিত্রে অনবদ্য অক্ষয় খান্না, আর. মাধবন তাঁর অজয় সান্যাল বা অজিত দোভালের চরিত্রে এক নতুন দিগন্ত এনেছেন, এসপি চৌধরী আসলাম চরিত্রের নয়া অবতারে সঞ্জয় দত্ত অসাধারণ, মেজর ইকবাল চরিত্রে অর্জুন রামপাল-ই বা-কম কীসে, নবাগতা সারা অর্জুন প্রথম দর্শনেই নজর কেড়ে নেয় ইয়ালিনার চরিত্রে।

একই সঙ্গে শাশ্বত সচদেবের সুরে ১১ টি গানের ডালি সত্যিই অপরূপ। জসকীরত সিংহ রাঙ্গী থেকে হামজা আলির রূপান্তর এবং প্রতিটি মেক আপ, লুক সবই দুর্দান্ত। সঙ্গে অনবদ্য সেট সেটিং। সিনেমাটির দু’টি পর্বই বেশ দীর্ঘ সময়ের হলেও দুর্দান্ত সিনোমাটোগ্রাফির কারণে দর্শকের মনে বিরক্তি বা ক্লান্তির উদ্রেক করে না। দুই পর্বের এই ফিল্ম দেখার পর ভারতীয় হিসেবে নিজেকে গর্ব অনুভব করবেন দর্শক। ‘ধুরন্ধর’-এর মাধ্যমে নতুন উচ্চতা অর্জন করল ভারতীয় সিনেমা। □

ঘোড়ার পরাধীনতা

জঙ্গলে তখন ঘোড়ার দল স্বাধীনভাবে বাস করত। কেউ তাদের বিরক্ত করত না। ইচ্ছেমতো ঘাস খেত, ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াত। বেশ সুখে তাদের দিন কাটছিল।

কিন্তু এই সুখ তাদের বেশিদিন স্থায়ী হলো না। কোথা থেকে এক হরিণের পাল তাদের দলে এসে পড়ল। সেগুলি মহাবিচ্ছু। তারা তো একে ঘাস খেয়ে নেয়, তার উপর যেগুলো বাকি থাকে সেগুলোও নষ্ট করে ফেলে।

ঘোড়ারা পড়ল মহা মুশকিলে। তাদের খাওয়াদাওয়ার বেশ অসুবিধে হতে লাগল। এমতাবস্থায় ঘোড়াদের সর্দার মনে করল যেভাবেই হোক হরিণগুলিকে জব্দ করতেই হবে। হরিণদের তাড়া করলেও কোনো লাভ হলো না। তাদের সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারল না।

একদিন ঘোড়ার সর্দার জঙ্গলের মধ্যে কয়েকজন মানুষ দেখতে পেল। ছুটতে ছুটতে তাদের কাছে গিয়ে বলল— ভাই, ওই হরিণগুলি আমাদের খুব ক্ষতি করছে, তাদের উচিত শিক্ষা দিতে না পারলে আমাদের খুব বিপদ হবে। তোমরা যদি আমাকে একটু সাহায্য করো, তাহলে আমাদের খুব উপকার হয়।

এদিকে মানুষরাও অনেকদিন থেকেই চাইছিল ঘোড়াগুলিকে বশ মানাতে। কিন্তু কিছুতেই পারছিল না। ঘোড়া এত দ্রুতগামী, সুঠাম চেহারার, শক্তপোক্ত প্রাণী যে মানুষরা তাদের সঙ্গে পেরে উঠতে পারছিল না। অথচ ঘোড়াকে পোষ মানাতে পারলে তাদের খুবই সুবিধা হতে পারে।

ঘোড়ার সর্দারের আহ্বান শুনে মানুষরা যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। তারা বলল, ঠিক আছে। এতে আর ভাবনা কী। তুমি একটু সাহায্য করলেই হরিণগুলিকে জব্দ করতে পারি।

ঘোড়ার সর্দার বলল, ভালো কথা! তা আমাকে কী করতে হবে বলে দাও। মানুষরা বলল, তোমাদের কয়েকজনের মুখে লাগাম পরিয়ে আমাদের কয়েকজনকে তোমাদের পিঠে বসতে দাও, তাহলেই আমরা হরিণগুলিকে এই জঙ্গল থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবো।

ঘোড়ার সর্দার বলল— বেশ, ভালো কথা। এই বলে তাদের কয়েকজনের পিঠে কয়েকজন মানুষকে বসতে দিল।

মানুষরা ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল বটে, কিন্তু হরিণ তাড়ানোর কোনো চেষ্টাই করল না। সোজা তারা নিজেদের আস্তানার দিকে চলে গেল। সেই থেকে মানুষ ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে নিজের কাজে ব্যবহার করতে শুরু করল।

জঙ্গলের স্বাধীন প্রাণী ঘোড়া মানুষের কাছে এভাবেই পরাধীন হয়ে গেল। আজ থেকে প্রায় চার হাজার থেকে সাড়ে পাঁচহাজার বছর আগে মানুষ ঘোড়াকে বন্য অবস্থা থেকে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করে।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

ফাওংপুই ব্লু

ফাওংপুই বা ফাওংপুই ব্লু মাউন্টেন জাতীয় উদ্যান উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরাম রাজ্যের সাইহা জেলায় অবস্থিত। এর নামকরণ হয়েছে ফাওংপুই পর্বতের নামে। এই উদ্যান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২১৫৭ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। এর আয়তন ৫০ বর্গকিলোমিটার। বছরের বেশিরভাগ সময় এই উদ্যান মেঘের পাতলা স্তর দ্বারা আবৃত থাকে। যার কারণে এটি দূর থেকে নীল দেখায়। এখানে পর্ণমোচী ও চিরহরিৎ বন, বিভিন্ন রকমের গাছপালা যেমন বাঁশঝাড় থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রজাতির তুলসীগাছের এক প্রাকৃতিক ভাণ্ডার রয়েছে। বিভিন্ন রকম জীবজন্তু, পাখি ও সরীসৃপে পরিপূর্ণ এই উদ্যান। নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস এই উদ্যান ভ্রমণের সেরা সময়।

এসো সংস্কৃত শিখি-১১০

कथम् দ্বারা প্রশ্ন
('কীরকম' দ্বারা প্রশ্ন)

अभ्यासं कुर्मः –

सिंह कथं गर्जति ?
সিংহ কীরকম গর্জন করে ?
कच्छपः कथं चलति ?
কচ্ছপ কীরকম চলে ?
युवकः कथं खादति ?
যুবক কীরকম খায় ?
वृद्धा कथं वदति ?
বৃদ্ধা কীরকম বলেন ?
अलका कथं गायति ?
অলকা কেমন গায় ?
विराट् कथं क्रीडति ?
বিরাট কীরকম খেলে ?

कथम् দ্বারা প্রশ্নং কুর্বন্তু।
'কীরকম' দিয়ে প্রশ্ন করার চেষ্টা করব।

ভালো কথা

নবাঙ্কুর সম্মাননা

গত ১১ এপ্রিল কেশব ভবনে স্বস্তিকা পত্রিকার বাংলা নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ এবং সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ অনুষ্ঠান হলো। প্রথমে সংস্কার ভারতীর মাতৃমণ্ডলী কয়েকটা দেশাত্মবোধক গান গাইল। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট লেখক নন্দলাল ভট্টচার্য মহাশয়কে এবছরের লেখক সম্মাননা প্রদান করা হলো। নবাঙ্কুর বিভাগে বেশি অংশগ্রহণের জন্য এবছর আমাকে 'উৎসাহিত' করা হয়েছে। বিশিষ্ট লেখকের মতোই আমাকেও উত্তরীয় পরিয়ে, কপালে চন্দনের টিপ দিয়ে, মিষ্টির প্যাকেট এবং 'বিমল-কুমার সমগ্র' বই দিয়েছে। তারপর আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করেছি। আমার মা-বাবাও সঙ্গে ছিলেন। এত ভিড় হয়েছিল যে বসার জায়গা পর্যন্ত ছিল না। বহু মানুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তবু আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। বন্দে মাতরম্ গানের পর অনুষ্ঠান শেষ হলো।

দীপমাল্য সাউ, ষষ্ঠশ্রেণী, রাধামাধব সাহা লেন, কল-৭।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ভারতবর্ষ

ধর্মবীর সিংহ, অষ্টমশ্রেণী, দেশবন্ধু রোড, পুরুলিয়া

ফুলে ভরা, ফলে ভরা, সুন্দর গন্ধে ভরা,
উত্তরে তার হিমালয়ের দুর্লঙ্ঘ্য ঘাঁটি,
শৌর্যে বীর্যে পরাক্রমে ভরা,
পশ্চিমে সিন্ধুসাগর ছুঁয়েছে যার মাটি।
বীরের ইতিহাসে ভরা, ধনসম্পদে ভরা যে দেশের মাটি
দক্ষিণে হিন্দুসাগর ছুঁয়েছে যার চরণ দুটি,
শস্যশ্যামলা করে গঙ্গা এসেছে বয়ে
পূর্বদিকে মিলেছে গঙ্গাসাগরে।
যে দেশেতে আছে কত নদ-নদী
যে দেশেতে আছে কত মুনি-ঋষি,
যে দেশ বিশ্ববাসীর গর্ব, স্বদেশের হর্ষ,
সে দেশের নাম হলো 'ভারতবর্ষ'।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব ও মহানিষ্ক্রমণ

গোপাল চক্রবর্তী

পর্বতরাজ হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামে এক রাজ্য ছিল। শাক্যরা এই রাজ্যের অধিবাসী। তাঁদের রাজা ছিলেন ইক্ষ্বাকুবংশীয় সমুদ্রসঞ্জাত চন্দ্রের মতো শুদ্ধোদন। শক থেকে শাক্যপদের উদ্ভব মনে করা হলেও সম্ভবত এঁরা শাকাহারী ছিলেন বলেই শাক্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বুদ্ধদেবকেও শাক্যসিংহ বলা হয়েছে। রাজা শুদ্ধোদনের পত্নী মায়াদেবীর লুম্বিনী উদ্যানে এক সর্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মায়। ইতিপূর্বে মায়াদেবী স্বপ্নে মেঘের মধ্যে চাঁদের মতো আপন শরীরে একটি শুভ্র গজরাজকে প্রবেশ করতে দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নকে শুভ মনে করে তিনি অন্তরকে সর্ববিধ কলুষতা ও পাপ থেকে মুক্ত করে তিনি বনে যেতেই মনস্থির করলেন। তপস্যার উপযোগী নির্জন বনভূমি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত হওয়ায় তিনি রাজাকে লুম্বিনী নামক উদ্যান কুঞ্জে যাওয়া এবং থাকার কথা বললেন। যেটি পুষ্পপল্লব ও ফলবান বৃক্ষের সমন্বয়ে চিত্ররথ কাননের মতোই মনোহর ছিল।

পুষা নক্ষত্র যুক্ত পূর্ণিমাতিথিতে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব। উরু থেকে ঔর্ব, হস্ত থেকে পৃথু, মাথা থেকে ইন্দ্রতুল্য মান্ধাতা এবং বাহুমূল থেকে কক্ষীবাণের মতো মাতার পার্শ্ব থেকে বুদ্ধের জন্ম হলো। পৃথিবীতে অবতীর্ণ বালকটি বালসূর্যের মতো সহনীয় তেজোদীপ্ত হলেও কমনীয় কান্তি চন্দ্রের মতোই নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'অবদান' সাহিত্যে বুদ্ধকে 'সূর্যসহস্রাতিরেকপ্রভুঃ' অর্থাৎ সহস্র সূর্যের মতো দীপ্তিমান অথচ চন্দ্রের মতো নয়ন মনোহর রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবস্তুতে তাঁকে 'বালরবিপ্রকাশঃ' বলা হয়েছে।

দেবতারা কুমারের জন্মে আনন্দিত হলেন। কুমারের জন্মলগ্নে ভূমিকম্প হলেও সুপবন প্রবাহিত হয় এবং মেঘশূন্য আকাশ থেকে সচন্দন পুষ্পবৃষ্টি হয়। এইসব অলৌকিক লক্ষণ বিচার করে বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা বলেন এই নবজাতক পার্থিব সুখ চাইলে রাজচক্রবর্তী সম্রাট হবে, আর বৈরাগ্য প্রার্থনা করলে মহামুনি হয়ে শ্রেষ্ঠত্বে সকলকে অতিক্রম করবে। অন্তরীক্ষে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব বার্তা শ্রবণ করে মহর্ষি অসিত অতি দ্রুত কপিলাবস্তুতে এসে রাজা শুদ্ধোদনের পুত্রকে দর্শন করলেন। রাজপুত্রের সুলক্ষণগুলি দর্শন করে ঋষি অশ্রুপাত করতে লাগলেন। কারণ মৃত্যু আসন্ন হওয়ায় এই মহাপুরুষের অতুলনীয় শিক্ষা থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন। অসিত মুনির প্রস্থানের পর আনন্দিত রাজা কারাগার থেকে বন্দিদের মুক্তি দিলেন। ব্রাহ্মণদের ভূমি ও গোদান করলেন এবং আনুসঙ্গিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান শেষ করে পুত্রকে নিয়ে সপরিবারে রাজধানীতে ফিরলেন।

পুত্রের জন্মের পর রাজ্যে সমৃদ্ধির মহাপ্লাবন হলো। শত্রুরা রাজার পদানত হলো। 'মহাবস্তুবদান' থেকে জানা যায়, কুমার যেদিন জন্ম গ্রহণ করেন সেদিন পাঁচশত শাক্য শিশুপুত্র, পাঁচশত শাক্য শিশুকন্যা, পাঁচশত দাস, পাঁচশত দাসী, পাঁচশত অশ্ব, পাঁচশত হস্তী জন্মগ্রহণ করে। রাজমণ্ডলবর্তী রাজারাও প্রণাম জানিয়ে রাজা শুদ্ধোদনের উৎকর্ষ স্বীকার করেন। শিশুবুদ্ধের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রাজা শুদ্ধোদন যে সমৃদ্ধি ও অভ্যুদয় প্রাপ্ত হন মহাকবি অশ্ব ঘোষের রচনাতেও তার সাড়ম্বর প্রকাশ দেখা যাচ্ছে।

বুদ্ধের আবির্ভাবের পর কপিলাবস্তুতে বজ্রপাতহীন বৃষ্টিপাত হলো। বিনা পরিশ্রমে উৎপন্ন হলো ফসল। রাজ্যে মিথ্যাবাদী, চোর, অদাতা, অব্রতী, হিংস্র কেউ রইল না। সকল বিষয়ে সার্থকতা ঘটায় রাজা পুত্রের নামকরণ করলেন 'সবার্থসিদ্ধ'। বুদ্ধের জননী সতী সাধ্বী মায়াদেবী পুত্রের বিশাল প্রভাব দেখে আনন্দ ধারণ করতে না পেরেই যেন স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন। মাতৃস্বসা গৌতমী পরম স্নেহে শিশু সিদ্ধার্থকে পালন করলেন। গৌতমীর স্নেহে লালিত পালিত, তাই সিদ্ধার্থের আরেক নাম গৌতম। যথাসময়ে সিদ্ধার্থের উপনয়ন হলো। অসামান্য প্রতিভাধর সিদ্ধার্থ অল্প সময়ে বহুশাস্ত্রে পারদর্শী হলেন।

শৈশব থেকেই সিদ্ধার্থ সংসার বিরাগী, ভাবজগতে তাঁর বিচরণ। এই বিরাগী পুত্রকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য পিতা শুদ্ধোদন সর্বসুলক্ষণা যশোধরার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহ দিলেন। কোমলমতি সিদ্ধার্থ যাতে কোনো ভয়ানক দৃশ্য না দেখেন সেই জন্য রাজা শুদ্ধোদন সমুচ্চ প্রাসাদের অভ্যন্তরে গুপ্তকক্ষে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করলেন। রাজা নিজেও পুত্রের কল্যাণ কামনায় সংযত, কল্যাণকর জীবনযাপন করতেন। কালক্রমে সিদ্ধার্থর বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে চন্দ্রের মতো রূপবান এক পুত্র লাভ করলেন, নাম রাখা হলো রাহুল।

অবরুদ্ধ কুমার চারণদের মুখে কূজনরত পক্ষী, দিঘি, শ্যামল বনানীর কথা শুনে বনদর্শনে উদগ্রীব হলেন। রাজার আদেশে সমস্ত অশুভদৃশ্য পথ থেকে অপসারিত হলো। সুসজ্জিত পুষ্পাকীর্ণ পথে রাজা সিদ্ধার্থকে বনভূমি দর্শনের অনুমতি দিলেন। স্বর্ণরথে কুমার চললেন বনভূমি দর্শনে। পুরনারীরা বাতায়ন থেকে মুগ্ধ বিস্ময়ে কুমারকে নিরীক্ষণ করলেন। হৃষ্টচিত্ত কুমার ভাবলেন তাঁর বুঝি পুনর্জন্ম হলো। হঠাৎ দৈবক্রমে এক পক্বকেশ, শিথিল ন্যুব্জ, যষ্ঠী হাতে এক বৃদ্ধকে দেখলেন। সারথিকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন ওই ব্যক্তি জরাগ্রস্ত। জরা রূপ, স্মৃতি, পরাক্রম ধ্বংস করে। সকলেই বয়সের ভারে জরাগ্রস্ত হয়। বিষণ্ণমনে কুমার প্রাসাদে ফিরলেন।

ফঃ ৬

আবার একদিন অরণ্যের শোভা দর্শনে গিয়ে এক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কষ্ট, দুঃখ অসহায়তা প্রত্যক্ষ করে চিন্তাক্লিষ্ট কুমার প্রাসাদে ফিরলেন। তৃতীয়বার রাজা শুদ্ধোদন নবরসে কুমারকে আপ্লুত করার জন্য প্রমোদ উদ্যানে কলাবিদ্যায় পারদর্শী শ্রেষ্ঠ বারাঙ্গনাদের পাঠিয়ে রথ ও সারথি পরিবর্তন করে কুমারকে ভ্রমণে পাঠালেন। এবারও দেবতার মায়ায় এক মৃতদেহ বাহিত হতে দেখে সারথির কাছে জানলেন ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, চেতনার বিনাশ ঘটিয়ে মানুষকে শুষ্ক কাষ্ঠের মতো নির্জীব সত্তায় পরিণত করে। মহাত্মা, মধ্যম, হীন সকলেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বিষণ্ণ, দুঃখিত, স্তম্ভিত কুমার জীবনের শোচনীয় পরিণাম মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে প্রাসাদে ফিরতে চাইলেও রাজার নির্দেশে সারথি তাঁকে পদ্মখণ্ড উদ্যানে নিয়ে গেলেন। সেখানে বারাঙ্গনারা কুমারকে বেষ্টন করে বিভিন্ন কলাবিদ্যা প্রয়োগ করতে লাগল। কুমার তখন নবব্রতধারী মুনির মতো বিঘ্নভয়ে কাতর হলেন।

মৃত্যু, জরা, ব্যাধির চিন্তায় সমগ্র জগৎ যাঁর কাছে প্রজ্বলিত অগ্নিসম প্রতিভাত হচ্ছে, সেই কুমার সিদ্ধার্থ, রাজপুরোহিত পুত্র উদায়ীর পুরাণাশ্রিত বহু প্রেমকাহিনি শুনেও অবিচলিত ভাবেই সুন্দরীদের প্রত্যাখ্যান করলেন। তারা নগরে ফিরে গেলেন। পুত্রের বিষয় পরাঙ্মুখতার কথা চিন্তা করে রাজা শুদ্ধোদন বিনিদ্ররাত্রি যাপন করতে লাগলেন।

বিষয়ে প্রলোভিত না হয়ে তিরবিদ্ধ সিংহের মতো অশান্ত হলো কুমার সিদ্ধার্থের মন। পিতা শুদ্ধোদনের অনুমতি নিয়ে বন্ধু মন্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে সারথি যুক্ত রথে আরোহণ করে তিনি অরণ্যের শোভা দর্শনে বেরিয়েছেন। জমি চাষ করায় লাঙ্গলের ফলার আঘাতে মৃত কীটপতঙ্গ দেখে কুমার স্বজনবধের দুঃখ অন্তরে অনুভব করলেন। কৃষক ও ভারবহনকারী বলদের জন্য তিনি করুণা অনুভব করলেন। বৈদূর্যমণির মতো শ্যামল তৃণভূমিতে জামগাছের তলায় বসে জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন। অতঃপর কোনো দেবতা জরা-মৃত্যু ভীত এক সন্ন্যাসী শ্রমণের বেশে তাঁকে দর্শন দেন। তাঁকে বিহঙ্গের মতো আকাশে উড়তে দেখে কুমার সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করলেন। কিন্তু পিতা শুদ্ধোদন তাঁকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দিলেন না। সেদিন সিদ্ধার্থ বন্ধুদের সঙ্গে প্রাসাদে ফিরে গেলেন। কারণ তিনি না ফিরলে তাঁর বন্ধু ও সারথিকে রাজরোষে পড়তে হবে। তাঁদের যাতে কোনোরকম অপমান, লাঞ্ছনা, তিরস্কার ভোগ করতে না হয় সেই কারণে স্বভাবত করুণ হৃদয় সিদ্ধার্থ তৎক্ষণাৎ পরম কাঙ্ক্ষিত বনে গমন করলেন না। বন্ধুজন নিরপেক্ষ হওয়া সিদ্ধার্থের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁদের প্রতি কর্তব্যবশত তিনি নগরে ফিরে চললেন। সহসা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন না। জরা মৃত্যুর শাসনে বিচলিত সিদ্ধার্থ কামনাবশত নয়, গৃহত্যাগের মনোগত ইচ্ছা স্মরণে রেখেই গজরাজের মতো নগরে প্রবেশ করলেন। কুমারকে নগরে প্রবেশ করতে দেখে রাজপথে দাঁড়িয়ে এক রাজকন্যা— অঞ্জলি বদ্ধ করে বলে উঠলেন—

—ইহজগতে সেই স্ত্রী অবশ্যই সুখী ও সমৃদ্ধিশালী যার এইরকম স্বামী বর্তমান।

এই উক্তি সৌভাগ্যবতী যশোধরার আসন্ন দুর্ভাগ্যের পূর্বাভাস যেন সূক্ষ্মশ্লেষের আকারেই ব্যঞ্জিত হচ্ছে। যশোধরা সুখী কী দুঃখী সেটি বিতর্কের বিষয়।

কুমার সিদ্ধার্থ প্রাসাদে প্রবেশ করে উপস্থিত হলেন পিতা শুদ্ধোদনের কাছে। কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন—

—হে নরদেবতা! আমাকে সম্যক আদেশ করুন। মোক্ষের জন্য আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব। মানুষের বিচ্ছেদ তো স্থির হয়েই আছে।

পুত্রের কথা শুনে রাজা হস্তির দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত বৃক্ষের ন্যায় বিচলিত হলেন। পুত্রের অঞ্জলিবদ্ধ হাত ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—

—পুত্র! তোমার এই ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। প্রথম বয়সে মন চঞ্চল থাকায় জ্ঞানীরা ধর্মাচরণকে বহুদোষযুক্ত বলেছেন। হে ধর্মপ্রিয়, সুলক্ষ্মণ, তোমাকে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করে আমারই ধর্মাচরণের সময় উপস্থিত। হে নিত্য পরাক্রমী! বলপূর্বক গুরুজনদের বর্জন করলে তোমার ধর্ম কিন্তু অধর্মেই পরিণত হবে।

রাজার এই বাক্য শুনে সিদ্ধার্থ ধীর, স্থির, কোমল কণ্ঠে বললেন— পিতা! যদি চারটি ক্ষেত্রে আপনি আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারেন তবে আমি গৃহত্যাগ করব না। আমার জীবন মৃত্যুর জন্য নয়, ব্যাধি আমার স্বাস্থ্যকে হরণ করবে না, বার্ধক্য আমার যৌবনকে ছুঁড়ে ফেলবে না, বিপদ আমার সম্পদকে হরণ করবে না।'

কবি নবীনচন্দ্র সেন 'অমিতাভ' কাব্যে সিদ্ধার্থের প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করার চারটি শর্ত খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত করেছেন—

দেও দাসে দয়া করি; দিলে চারি বর
থাকিব সংসারে, গৃহ ছাড়িব না আর।
জরায় যৌবন-ফুল যেন না শুকায়, (১)
ব্যাধি যেন কভু নাহি পরশে আমায়, (২)
মৃত্যু যেন নাহি আসে নিকটে আমার, (৩)
পাই সে সম্পদ যাহা অক্ষয় অপার, (৪)
কুমার সিদ্ধার্থের এই চারটি শর্ত শুনে।

রাজা শুদ্ধোদন বললেন— এই অসম্যক চিন্তাপ্রসূত বুদ্ধি ত্যাগ কর। মনের অতি অভিলাষ অসঙ্গত এবং উপহাসের যোগ্য হয়।

পিতার কথা শুনে সিদ্ধার্থ বললেন— যদি এটা সঙ্গত না হয়, তবে আমাকেও বারণ করা উচিত নয়। আগুনে প্রজ্বলিত গৃহ থেকে যে বেরুতে চায় তাকে ধরে রাখা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত নয়।

মোক্ষাভিলাষী পুত্রের এহেন দৃঢ়তার কথা শুনে রাজা তাকে অবরুদ্ধ করার জন্য উত্তম সুরক্ষা এবং যথেচ্ছ কাম সম্ভোগের ব্যবস্থা করলেন। একদিকে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমার মতো যশোধরা পুত্র-সহ সোনার পালঙ্কে শায়িতা, অন্যদিকে বাদ্যযন্ত্র-সহ নৃত্যগীতে পটিয়সী বারাঙ্গনার দল। মধ্যখানে কুমার সিদ্ধার্থ। এই যথেচ্ছ ভোগের আয়োজন কুমারের কাছে বিষবৎ মনে হলো। রজনী গভীর হলে দেবতার ইচ্ছায় যশোধরা নিদ্রাবিভূত হলেন। বারাঙ্গনারা তাদের বাদ্যযন্ত্রের উপর সুপ্তিমগ্ন। নিদ্রামগ্ন নারীর বিকৃত রূপ দেখে বিতৃষ্ণ নিরাসক্ত কুমার প্রাসাদের বাইরে এলেন। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। সমস্ত প্রাসাদ নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কুমার সহিস ছন্দককে ডেকে প্রিয় অশ্ব কন্থককে বের করতে বললেন। সেই রজনীতে স্নেহময় পিতা, পত্নী যশোধরা, পুত্র রাহুল, অনুরক্ত প্রজাদের ছেড়ে কন্থকের পিঠে আরোহণ করে পথে বহির্গত হলেন। নগরদ্বার আপনিই উন্মুক্ত হলো।

(বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

এশিয়ার পরাধীন জাতির মুক্তিসূর্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ড. দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৬৭ সালে মুদ্রিত ইএফ ওটেনের 'Song of Atom and Other Verses' নামে একটি কবিতার বইতে সুভাষচন্দ্র বসুকে উদ্দেশ্য করে একটি কবিতা আছে। কবিতাটির মর্মার্থ হলো ঃ

''সুভাষ তোমার হাতে কি আমি একদিন নিগৃহীত হয়েছি? তোমার দেশপ্রেমিক হৃদয় আজ স্তব্ধ। আমি তা ভুলতে চাই। আমি মনে রাখতে চাই যে তোমার দেশে একদা তুমি যে রাজশক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেছিলে তা ছিল শক্তিমান। কিন্তু তুমি সাহসের সঙ্গে ইকারাসের মতো আকাশে পাখা মেলে অমরাপুরীর দুর্গ-প্রাচীর সংগ্রামের ঝড়ে ভেঙে ফেলার সাহসিক সংকল্প করেছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল তোমার দেশের যে-স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল এবং যার জন্য নিয়মতান্ত্রিক ও রূঢ় রক্তাক্ত দাবি করা হয়েছিল (কবি ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণের কথা বলেছেন— অনুবাদক) কিন্তু তোমার সম্মান ও মর্যাদাবোধ তোমাকে ইকারাসের মতো সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত করেছিল। (অর্থাৎ আপোশহীন সংগ্রামের পথে--- অনুবাদক) তোমার পাখা সূর্যের তাপে গলে গেল এবং সেই তাপ হচ্ছে ভারতের বিরাট হৃদয়ের দেশপ্রেমের আগুনের উত্তাপ, যা ভারতীয় সেনাদলের সহস্র বিজয়ের মধ্যে দীপ্তমান ও প্রবহমান।" এই কবিতায় তিনি আইকারাসের রূপকের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্রের দুঃসাহসিক কর্ম এবং স্বাধীনতার যুদ্ধকে সম্মান জানিয়েছেন। আগের সমস্ত তিক্ততা ভুলে তিনি সুভাষচন্দ্রকে 'দেশপ্রেমিক' বলে স্বীকৃত দিয়েছেন। অর্থাৎ ছাত্র সুভাষচন্দ্রের বীরত্ব অধ্যাপক ওটেন-সাহেবকে মুগ্ধ করেছিল তা স্পষ্ট।

১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে এই সংবাদ ২৩ আগস্ট সরকারিভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওটেন সাহেবের এই কবিতার জন্ম হয়। কবিতার নাম— Subhas Chandra Bose (oblit---1945)। ওটেন-নিগ্রহের ঘটনার কথা তো সর্বজনবিদিত। ১৯১৬ সালে ওটেন-সাহেব কিনা সুভাষচন্দ্রের দ্বারা প্রেসিডেন্সি কলেজে নিগৃহীত হয়েছিলেন বলে সকলেই মনে করেছিল— কিন্তু ঘটনাটা ঠিক তা নয়। ওটেন-সাহেবের দুর্ব্যবহারে ভারতীয় ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং সেই ছাত্রদের দলনেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র কিন্তু ওটেন-নিগ্রহ করেননি, যিনি নিগ্রহ করেছিলেন তাঁর নাম অনঙ্গমোহন দাস— সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী। ছাত্রনেতা হিসেবে সুভাষচন্দ্র অন্য কারোর ওপর দোষ চাপাননি এবং সমস্ত দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়ে শাস্তি গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের ওপর ব্রিটিশের জাতক্রোধ ছিল। অতএব দলপতিকেই বহিষ্কার করা হলো। যদিও অনুমান করা যেতে পারে— ওটেন-সাহেব সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেমকে হয়তো মনে মনে শ্রদ্ধা করেছিলেন— তা না হলে এমন একটি কবিতা নিশ্চয়ই তিনি লিখতেন না।

ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক কেন এত তিক্ত হলো সে প্রসঙ্গে আসা যাক। তখন দেশে ব্রিটিশ শাসন। সুভাষচন্দ্র রাজরোষে পড়লেন যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র চোদ্দ বছর এবং আজীবন তিনি ব্রিটিশের পয়লা নম্বর শত্রু। ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়। এর ঠিক তিন-বছর পরে ১৯১১ সালের ১১ আগস্ট কটকের র‍্যাভেনশ' স্কুলে সুভাষচন্দ্র দলপতি হয়ে ছাত্রদের নিয়ে ক্ষুদিরাম বসুর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেন। তার ফলে ওই স্কুলের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সেখানকার প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাসের কাছে জবাবদিহি চায় এবং তাঁকে কৃষ্ণনগর স্কুলে বদলি করে দেয়। সুভাষচন্দ্র সংকল্প করলেন এই ঘটনার প্রতিবাদ তাঁরা করবেন। প্রধান শিক্ষক বেণীমাধববাবুর বিদায়ের দিন স্কুলের ছাত্ররা দলে দলে গিয়ে কটক স্টেশনে তাঁর গলায় মালা পরিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলো। সুভাষচন্দ্রের গুরুভক্তি ও সাহসিকতায় গুরু মুগ্ধ হলেন এবং তাঁকে মানুষের মতো মানুষ হওয়ার আশীর্বাদ করলেন। সুভাষচন্দ্রের চোখে নামলো জলের ধারা। গুরু তাঁর এই শিষ্যটিকে শেখালেন— কূটবুদ্ধি শাসক সুকৌশলে ভারতীয়দের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে নিচ্ছে। অতএব শক্ত মাটিতে দাঁড়াতে হবে। ভবিষ্যতে অনেক বড়ো বড়ো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। বেণীমাধববাবু সুভাষচন্দ্রকে শিখিয়েছিলেন কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম, ঈশ্বর অনুরাগ, প্রকৃতিপ্রেম। 'সুভাষ' বলতে তিনি অজ্ঞান। সুভাষচন্দ্র আবার নতুন প্রতিবাদে নামলেন। আদর্শ শিক্ষক বেণীমাধববাবুর ফোটো তুলে তাঁরা স্কুলে টাঙালেন। শ্বেতপাথরের ফলকে লিখে রাখলেন তাঁর গুণাবলী। স্কুল কর্তৃপক্ষের টনক নড়লো। সুভাষচন্দ্রকে ওই স্কুল থেকে তাড়ানোর জন্য সরকার তৎপর হলো। সুভাষচন্দ্রও স্থির করলেন যে, স্বদেশি ছাত্রদের নিয়ে তিনি স্কুল ছাড়বেন। বাঙ্গালিরাই ছিল সেখানে ভালো ছাত্র। অতএব কর্তৃপক্ষ দমে গেল। ওই চোদ্দ বছর বয়সেই সুভাষচন্দ্র চিহ্নিত হলেন ব্রিটিশের শত্রুরূপে।

মাত্র পনেরো বছর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর আস্বাদন পেলেন

সুভাষচন্দ্র। জীবনের মোড় ঘুরলো নতুন পথে— জীবনের অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর পেতে লাগলেন তিনি। তাঁর সেজদাদা সুরেশচন্দ্র বসু বলেছেন— সুভাষচন্দ্র মাত্র ৯ বছর বয়স থেকেই ভোর ৪টায় উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে ধ্যানে বসতেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁর ধ্যান অটুট রেখেছিলেন। সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্য ও নিয়মিত ধ্যানের ফলে তাঁর মেধানাড়ী খুলে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন অসাধারণ স্মৃতিধর ও শ্রুতিধর। অতি অল্প বয়সেই তিনি জীবনের গতিপ্রকৃতি অনুভব করে ৩৮/২ এলগিন রোড, কলকাতার বাড়ি থেকে বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারকে ৩১ আগস্ট ১৯১৫ সালে চিঠিতে লেখেন— ''আমি এটা বেশ বুঝিতেছি দিন দিন যে আমার জীবনের একটা definite mission আছে তারই জন্য আমার শরীরধারণ...।'' মাত্র আঠারো বছরের তরুণ যে-ভাব চিঠিপত্রে ব্যক্ত করতেন তাকে জীবনদর্শন না বলে কোনো উপায় নেই। সুভাষ-দর্শন পাঠ্যসূচিতে সংযুক্ত হওয়া উচিত। বয়স তাঁর যাই হোক না কেন তাঁর বয়সের থেকে ব্যক্তিত্বের ভার সবসময়ই এগিয়ে থাকত প্রতিটি কার্যকলাপে ও পদক্ষেপে।

সুভাষচন্দ্রের বয়স যখন ছেচল্লিশ। ১৯৪৩ সাল। বিশ্বযুদ্ধের আবহে সেই বছরের জুলাই মাস থেকে তিনিই ছিলেন মিত্রশক্তির চোখে পূর্ব-এশিয়ার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, অন্যতম ত্রাস-সঞ্চারক ব্যক্তি। একথা বলেছেন— এসএ আইয়ার। খুব কাছ থেকে তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের মধ্যে পড়েন থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পিবুল সংগ্রাম। তিনি বলেছেন ঃ 'বুদ্ধের পাশে বসার মতো মাত্র একজন ব্যক্তি আছেন— তিনি নেতাজী বসু।' এসএ আইয়ারও বলেছেন— ''যাঁরা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁরা নেতাজীকে 'বুদ্ধ' বলতেন— এতই শান্ত ও নীরব ছিলেন যে, যখনই পারতেন তিনি তাঁর কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তার জন্য সময় বের করে নিতেন।''

সুভাষচন্দ্র যখন ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেছেন তখনও তিনি সকালে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে ধ্যান করে তারপর পড়াশোনা, আহারাদি করতেন— বলেছেন দিলীপকুমার রায়। নিরন্তর ধ্যান ও ব্রহ্মচর্যের ফলে তিনি দেবতা হয়ে গিয়েছিলেন। জাপানে নেতাজীকে প্রায় দেবতা-রূপে পূজা করা হয়েছে। সেনাদের প্রতি ছিল সর্বাধিনায়ক নেতাজীর অগাধ ভালোবাসা। যখন নেতাজী যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনে যেতেন তখন সেনানিবাসে পৌঁছে সর্বপ্রথম নিম্নতম সৈনিকের ভোজনশালায় প্রবেশ করে তাদের খাদ্য আস্বাদন করে দেখতেন সেটি খাদ্য না অখাদ্য। তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল তাঁর খাদ্যও যেন ঠিক সৈনিকদের খাদ্যের মতো হয়। স্বাধীনতার সৈনিকরা তাঁকে এত ভালোবাসতেন যে যদি তাঁরা কোনো অফিসারের মুখে শুনতেন যে নেতাজী তাঁদের সঙ্গে মিলনের আশায় পথ চেয়ে আছেন— সেই সৈনিক অক্ষম হলেও জোর করে হামাগুড়ি দিয়ে পঞ্চাশ মাইল পথ পেরিয়ে নেতাজীর কাছে পৌঁছে তাঁকে দর্শন করে হাসিমুখে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তেন।

যেখান থেকে শুরু হয়েছিল--- ওটেন-সাহেবের লেখা কবিতা দিয়ে, সেখানে ফিরে যেতে হচ্ছে। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর খবর সরকারিভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হলেও এবং ১৯৬৭ সালে ওটেন-সাহেবের 'সুভাষপ্রশস্তি' প্রকাশিত হলেও নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ সম্পর্কে যা যা তথ্য রাজনৈতিক পর্যায়ে পাওয়া গিয়েছে তাতে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে নেতাজীর মৃত্যু বিমান-দুর্ঘটনায় হয়নি। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইহোকুতে কোনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি— সুভাষচন্দ্রও প্রয়াত হননি। জার্মান গোয়েন্দা-বিভাগের পল লেভারক্যুন বললেন— যদিও রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে যে সুভাষচন্দ্র বসু বিমান-দুর্ঘটনায় মারা গেছেন তবুও তথ্যগতভাবে তাকে মেলানো যাচ্ছে না। তখন জেনারেল ম্যাক আর্থার বলেছিলেন— 'তিনি আবার পালিয়েছেন, যদি তিনি ফিরে আসেন তাহলে সমগ্র এশিয়া আমাদের মুঠো থেকে আলগা হয়ে যাবে।' 'চন্দ্র বোস'-কে সামলাতে গিয়ে ব্রিটিশের ঘুম উড়ে গিয়েছিল। পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতেই সুভাষচন্দ্র বসু 'নেতাজী' হয়েছিলেন— ভারতবর্ষ পরাধীন না হলে সুভাষচন্দ্র বসুকে 'নেতাজী' হতে হতো না। এমন নয় যে, শুধুমাত্র ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে চেয়ে সুভাষচন্দ্র বসু নিষ্কাম কর্মযোগী হয়েছিলেন। একথা যদিও ইতিহাসে পড়ানো হয় না, তবুও একথা সত্য যে, সমগ্র এশিয়ায় যত পরাধীন জাতি ছিল তাদের প্রত্যেককে স্বাধীন করতে নেতাজী মনপ্রাণ অর্পণ করেছিলেন। আক্ষরিক অর্থে তিনি ছিলেন সমগ্র এশিয়ার পরাধীন জাতির মুক্তিদাতা। তাই তিনি সমগ্র এশিয়ার মুক্তিসূর্য।

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। সুভাষচন্দ্র একে স্বাগত জানান। তিনি বুঝেছিলেন যে এই সুযোগে এক সুবর্ণ সুযোগ মিলবে এবং ভারতের পক্ষে তা অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করবে যাতে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হবে। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন, জার্মানি ব্রিটেনের ওপর আঘাত হানলেই সেই চাপ সামলাতে ইংল্যান্ড ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ফলে, ভারতের ওপর চাপ কমতে থাকবে। সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা সম্পর্কে মাইকেল এডওয়ার্ডস্ বলেন— ''অন্যান্য কংগ্রেসি নেতৃবৃন্দের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন স্বচ্ছ ধারণার খুবই অভাব ছিল। গান্ধীজী ও নেহরুর ইংরেজদের এই অস্বস্তির সুযোগ নেওয়ার কোনো ইচ্ছেই ছিল না। মানসিকতার দিক দিয়েই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতি ছিল গান্ধীজীর পূর্ণ সহানুভূতি। ফ্যাসিবাদ বিরোধী নেহরুর প্রগাঢ় আস্থা ছিল এমন গণতন্ত্রে ব্রিটেন যা ভারতে অনুসরণ করেনি।''

সুভাষচন্দ্র যা চেয়েছিলেন তাই-ই হলো। প্রথম পর্যায়ে জার্মানরা যুদ্ধে জিতলো। তাতে ব্রিটেনে ও ভারতে ইংরেজদের আত্মবিশ্বাস ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। ১৯৪০ সালে জুন মাসে সুভাষচন্দ্র তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে ইংরেজদের তাড়ানোর জন্য গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে বিফল মনোরথ হলেন। ওই একই লক্ষ্যে অবিচল থেকে যুগ্ম-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সুভাষচন্দ্র জিন্নার সঙ্গে দেখা করে আবার বিফল মনোরথ হলেন। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন--- পূর্ণ স্বাধীনতা কোনো স্বায়ত্তশাসন নয়। এমনকী ভারতের সৈনিকরা ব্রিটেনের পাশে থেকে বিশ্বযুদ্ধে লড়বে এটাও

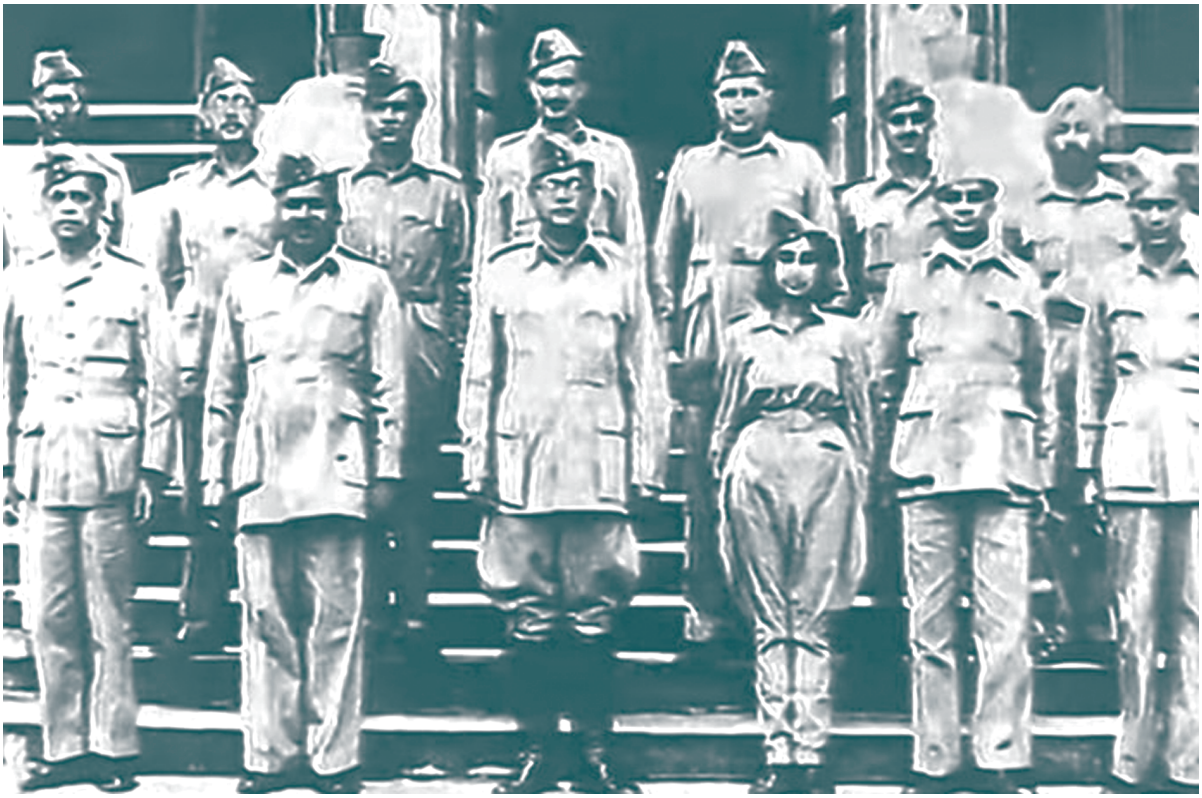

সুভাষচন্দ্র কখনই চাননি। প্রতিবাদী সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হলো। জেলে থেকে তিনি বুঝতে পারলেন নিজের দেশে থেকে কোনো ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলা সম্ভব নয়। জেল থেকে মুক্তি পেতে তিনি আমরণ অনশন চালালেন। জেল-মুক্তির পরে চল্লিশ দিন নিজের বাড়ির ভেতরে রইলেন এবং শয্যাকক্ষ ত্যাগ করলেন না। এই সময়ে তিনি সমগ্র যুদ্ধপরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলেন। বিভিন্ন দেশের বিগত দু'শো বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুচিন্তিত পর্যালোচনা করে দেখলেন বহিঃশক্তি ছাড়া কোনো দেশই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। অতএব 'শত্রুর শত্রু— আমার মিত্র' এই নীতিতে বদ্ধপরিকর হলেন। আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার জন্য ইমন ডি. ভ্যালেরা আমেরিকার সাহায্য নিয়েছেন; চীনের রাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য সান-ইয়াৎসেন জাপানের সাহায্য নিয়েছেন; লেনিন রাশিয়ার অত্যাচারী জার-রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার জন্য জার্মানির সাহায্য নিয়েছেন— অতএব ভারতের মুক্তির জন্য বিদেশি সাহায্য গ্রহণ দোষাবহ নয়।

এই পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্রকে নিজের দেশ ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছিল। গান্ধীবাদীরা যদি তখনই সংকীর্ণ রাজনীতি ছেড়ে সংগ্রামে নামতেন তাহলে সুভাষচন্দ্রকে দেশ ছাড়তে হতো না। সুভাষকে নিষ্ক্রিয় রাখতে গান্ধীজী বদ্ধপরিকর ছিলেন। অবশেষে, সুভাষচন্দ্র তাঁর স্বদেশপ্রেম ও আত্মবিশ্বাসকে পাথেয় করে ১৯৪১ সালের ১২ থেকে ১৮ জানুয়ারি-র মধ্যে কোনো একটি দিনে (হয়তো) তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি থেকে অন্তর্হিত হলেন। তারপর থেকে বিশ্বের ইতিহাসে তৈরি হলো চমক আর রহস্য।

বহু প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নেতাজী আজাদ হিন্দ্ সরকার ও আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন। যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন মাতৃভূমিকে ব্রিটিশের হাত থেকে পূর্ণ মুক্ত করে পূর্ণ স্বাধীন করার জন্য— কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষের কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও ব্রিটিশের গোষ্ঠীবদ্ধ চক্রান্তে ভারতীয় সৈনিকরা এবং ভারতের জনগণ জানতেই পারেনি যে নেতাজীর সঙ্গে ব্রিটিশের যুদ্ধ চলছে। এই না-জানার কারণেই ব্রিটিশের সহায়তাকারী ভারতীয় সৈনিকরা প্রাণ নিয়েছে স্বাধীনতা সৈনিকদের— একথা ইতিহাসের পাঠ্যে লেখা হয়নি। দুষ্ট, শঠ, অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী ব্রিটিশের কাছে কমিউনিস্টরা সহায়তা চেয়েছিল জাপানের পঞ্চম বাহিনীর নাম করে স্বাধীনতা সৈনিকদের প্রতিহত করার জন্য--- তা সফলও হয়েছিল। তৎকালীন ভারতবর্ষের জনসাধারণ ও সৈনিকরা জেনেছিল জাপান ভারতকে আক্রমণ করেছে। যদি তারা জানত নেতাজী এসে পড়েছেন তাদের স্বাধীন করার জন্য, তাহলে ইতিহাসের ধারা অন্য খাতে বইত। নেতাজী অনেক আগেই বুঝেছিলেন, এদেশ ছাড়ার আগে ব্রিটিশ ভাগবাঁটোয়ারা করে দিয়ে যাবে তাই তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলেছিলেন কিন্তু ভারত পেয়েছিল, dominion status —ভারত জননীর দু'হাত কাটা স্বাধীনতা।

নেতাজীর ভয়েই ব্রিটিশ তড়িঘড়ি এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে— এ কথা ১৯৫৫ সালে প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন অস্থায়ী রাজ্যপাল ফণিভূষণ চক্রবর্তীকে বলেছিলেন। এ চিরসত্য। □

সীমাহীন নৃশংসতা ঃ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনে সরকারি নীরবতা আর কতদিন অব্যাহত থাকবে ?

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

পৃথিবীর ইতিহাসে নৃশংসতার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে— যুদ্ধ, গণহত্যা, জাতিগত নিধন, মজহবি উগ্রতা আরও কত কী। কিন্তু বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর যে দীর্ঘস্থায়ী, পুনরাবৃত্ত ও কাঠামোগত হিংসা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলমান, তা কেবল সংগঠিত অপরাধের ধারাবাহিকতা নয়; এটি একটি গভীর প্রশাসনিক ও সামাজিক সংকটের স্পষ্ট প্রতিফলন। এখানে হিংসা কেবল শারীরিক আক্রমণে সীমাবদ্ধ নয়; এটি অর্থনৈতিক বঞ্চনা, আইনি বৈষম্য, সামাজিক ভীতি এবং সাংস্কৃতিক প্রান্তিকতার এক বহুমাত্রিক বাস্তবতা।

এই বাস্তবতার মূল শিকড় খুঁজতে গেলে স্বাধীনতার পরবর্তী দেশগঠন প্রক্রিয়ার দিকে তাকাতে হয়। একটি স্বাধীন দেশের অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল সকল নাগরিকের সকল ক্ষেত্রে সমানাধিকার নিশ্চিত করার । কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে সেই প্রতিশ্রুতি বারবার ভঙ্গ ও উপেক্ষিত হয়েছে। শত্রু সম্পত্তি আইন (Enemy Property Act) এবং তার উত্তরসূরি Vested Property Act শুধু আইনি কাঠামো নয়; এগুলো হয়ে উঠেছিল এক ধরনের বৈধ লুণ্ঠনের মাধ্যম। এই ধরনের বীভৎস, কালা আইন প্রয়োগের ফলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি হারিয়েছে; কখনো প্রশাসনিক জটিলতায়, কখনো জালিয়াতির মাধ্যমে, আবার কখনো সরাসরি প্রভাবশালীদের দখলদারিত্বের কারণে।

এই প্রক্রিয়াটি কেবল সম্পত্তি হারানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটি সংখ্যালঘু সমাজের মধ্যে একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক ভীতি সৃষ্টি করেছে; যেখানে নাগরিকত্বের অনুভূতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দেশের প্রতি আস্থা ক্ষয়ে যায়। একজন নাগরিক যখন নিশ্চিত হতে পারে না যে তার ঘর, তার জমি, তার মন্দির বা তার ধর্মীয় পরিচয় নিরাপদ নয়, তখন তার কাছে সেই দেশ একটি নিরাপত্তার আশ্রয় নয়, বরং অনিশ্চয়তার প্রতীক হয়ে ওঠে।

২০০১ সালের নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা এই দীর্ঘস্থায়ী বৈষম্যের এক নির্মম বিস্ফোরণ ছিল। বিভিন্ন জেলায় সংগঠিত আক্রমণ, নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া; এসব কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। বরং এগুলো ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনকে কাজে লাগিয়ে একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কৌশল। এই হিংসার মধ্য দিয়ে যে বার্তাটি দেওয়া হয়েছিল তা ছিল স্পষ্ট— 'এ দেশ হিন্দুদের নয়'।

এই বার্তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায়নি; বরং নতুন নতুন ঘটনার মাধ্যমে এর

পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কখনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে, কখনো মজহবি অনুভূতিকে উসকে দিয়ে, আবার কখনো সরাসরি সন্ত্রাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। এই ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট প্যাটার্ন রয়েছে— প্রথমে উত্তেজনা সৃষ্টি, তারপর সংগঠিত আক্রমণ এবং শেষে বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা বা ব্যর্থতা।

এই প্রেক্ষাপটে দীপু দাসের হত্যাকাণ্ড এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের খুরুশকুলে নয়ন সাধুর ওপর সংঘটিত নৃশংসতা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এগুলো কেবল ব্যক্তিগত কোনো ঘটনা নয়; এগুলো একটি বৃহত্তর সংকটের প্রতীক। একজন সাধারণ নাগরিক কিংবা একজন ধর্মীয় সেবায়েত— কেউই এই মজহবি হিংসার বাইরে নয়। যখন একজন মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়, তখন তা কেবল হত্যাকাণ্ড নয়; তা হলো ভীতি প্রদর্শনের রাজনৈতিক ভাষা। এই হিংসার পেছনে যে মজহবি ও অর্থনৈতিক স্বার্থ কাজ করে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ভূমি দখল, সম্পত্তি দখল এবং সামাজিক প্রভাব বিস্তারের জন্য সংখ্যালঘুদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা একটি পুরনো কৌশল। এটি একটি সুসংগঠিত চক্র— ভয় সৃষ্টি, আক্রমণ ও দখল। এই চক্রটি ভাঙতে না পারার মূল কারণ হলো বিচারহীনতা এবং প্রশাসনিক নীরবতা ।

বিচারহীনতা এখানে কেবল একটি আইনি ব্যর্থতা নয়; এটি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট। যখন অপরাধীরা শাস্তি পায় না, তখন তারা আরও সাহসী হয়ে ওঠে। যখন ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার পায় না, তখন তারা নীরব হয়ে যায়। এই নীরবতাই অপরাধকে টিকিয়ে রাখে। সরকার ও প্রশাসন এখানে থাকে নির্বিকার। একটি দেশ তখনই শক্তিশালী হয়, যখন সে তার সবচেয়ে দুর্বল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। কিন্তু যখন সংখ্যালঘুরা বারবার আক্রমণের শিকার হয় এবং বিচার পায় না, তখন সেই দেশের সরকারের নৈতিক ভিত্তি প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হয়। সেই দেশের সরকারের

নীরবতা, পদক্ষেপ গ্রহণে বিলম্ব, বা অকার্যকারিতা— সবকিছুই মিলিয়ে একটি বার্তা দেয় যে, 'এই অপরাধগুলো খুব গুরুতর নয়।' এই বার্তাটি যেকোনো দেশের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ এটি কেবল সংখ্যালঘুদের নয়, পুরো সমাজের নিরাপত্তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। আজ যে হিংসা একটি গোষ্ঠীর ওপর চলছে, কাল তা অন্য গোষ্ঠীর ওপরও নেমে আসতে বাধ্য। হিংসা কখনো সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি ছড়িয়ে পড়ে নিজস্ব গতিতে ।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন ছিল মৌলিক পরিবর্তন। প্রথমত, আইনের শাসনকে কার্যকর করতে হবে; কাগজে নয়, বাস্তবে। দ্বিতীয়ত, বিচার প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে। তৃতীয়ত, সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি সুরক্ষায় কঠোর ও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। চতুর্থত, সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে যাতে গুজব ও উসকানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। কিন্তু এর চেয়েও বড় প্রয়োজন— নৈতিক সাহস। একটি সমাজ তখনই পরিবর্তিত হয়, যখন তার মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শেখে। নীরবতা এখানে নিরপেক্ষতা নয়, এটি এক ধরনের অংশগ্রহণ। নয়ন সাধুর রুদ্রাক্ষের মালা এবং দীপু দাসের রক্ত আজ মানবজাতির বিবেকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছে— সবাই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কি কথা বলবে, সোচ্চার হবে, নাকি চুপ করে থাকবে? তাদের আগুনে পুড়িয়ে কোটি হিন্দুর মনে অনন্ত আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতার আরেকটি উদ্বেগজনক দিক হলো— আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বৈষম্য বা বিতর্কের অভিযোগ উঠে আসা। উদাহরণস্বরূপ, চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুকে জেলে আটক করে রাখার ঘটনাটি বিভিন্ন মহলে হাজারো প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে যে, তাঁর বিরুদ্ধে আনা মামলার প্রেক্ষাপট ও গ্রেপ্তারি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নেই এবং দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে আটক রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। যদি কোনো নাগরিক, বিশেষত একটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সদস্য, ন্যায়বিচারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হন বা তার ক্ষেত্রে আইনের অপপ্রয়োগ ঘটে, তাহলে তা কেবল একটি ব্যক্তিগত ঘটনা থাকে না; বরং বৃহত্তর সংকটের রূপ নেয়। সেই দেশের সংবিধান, আইন-আদালত, বিচার প্রক্রিয়া— সবকিছুর ক্ষেত্রেই বাড়ে অনাস্থা। এ ধরনের ঘটনা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আনে--- আইনের শাসন কি সবার জন্য সমানভাবে কার্যকর, নাকি কিছু ক্ষেত্রে তা প্রভাবিত বা বেছে বেছে প্রয়োগ করা হচ্ছে? যখন একদিকে মজহবি হিংসার শিকার সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার পেতে দেরি হয়, আর অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিবিশেষকে আটক বা বিচারপ্রক্রিয়া নিয়েই বিতর্ক তৈরি হয়, তখন পুরো বিচারব্যবস্থার ওপরই আস্থার সংকট তৈরি হয়।

এই প্রেক্ষাপটে দীপু দাস, নয়ন সাধু কিংবা চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভু— নামগুলো আলাদা হলেও, তাঁদের ঘিরে যে প্রশ্নগুলো উঠে আসে তা একই সুতোয় গাঁথা, যা বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার দানের প্রক্রিয়ার ওপর প্রশ্ন তোলে। ইতিহাসের নির্মম সত্য হলো— নীরবতা কখনো নির্দোষ নয়। সরকারি নীরবতা সবসময়ই কোনো না কোনো অন্যায়ের পাশে দাঁড়ায়। এবং যদি এই নীরবতা ভাঙা না যায়, তবে এই নৃশংসতার ইতিহাস কেবল দীর্ঘতরই হবে; যা হবে আরও গভীর, আরও অন্ধকার, আরও লজ্জাজনক। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৭২)

বোলতী বীমারী

সঙ্ঘ কার্যের জন্য কষ্ট সহিষ্ণুতার অজস্র উদাহরণ আমরা ডাক্তারজীর জীবনে দেখতে পাই। শরীর-মন-ধন রাষ্ট্রসেবার উদ্দেশ্যে পূর্ণ সমর্পণের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তিনি নিজেই। এভাবে শরীরের কষ্টকে উপেক্ষা করে নিরন্তর ইষ্ট কর্মে (সঙ্ঘকার্যে) নিরত থাকা কোনো সিদ্ধ সাধক ছাড়া সম্ভব নয়। বলার অপেক্ষা রাখে না তিনি এমনই একজন উচ্চমার্গের রাষ্ট্রতপস্বী সাধক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমরা জানি বেশ কিছুদিন থেকেই ডাক্তারজী মোটামুটি অসুস্থতাকে বহন করেই নিরবচ্ছিন্ন নিত্য কার্য করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ১৯৩৫ সালের দিকে অসুখ যেন নবকলেবরে শক্তিশালী হয়ে উঠল। বিদর্ভ ভ্রমণ শেষে তার করাল রূপ যেন প্রকাশ পেতে থাকলো, কষ্ট ও সহনশীলতার মধ্যে যেন শুরু হলো এক তীব্র প্রতিযোগিতা। এবার ডাক্তারজীর লেখা পত্র থেকেই সরাসরি সে কথা জানা যাক—

"মনে হচ্ছে বিদর্ভের প্রবাস স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হয়নি। ওখান থেকে ফিরে আসার পর প্রতিদিন অল্প জ্বর হচ্ছে এবং দুর্বলতা বেশ বেড়ে গেছে। কিন্তু কাশি একেবারেই নেই তা সত্ত্বেও ফুসফুসে যথেষ্ট দুর্বলতা অনুভব করছি। অতএব তীব্র ইচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে কানপুরে ভ্রমণ স্থগিত রাখতে হচ্ছে।" কিন্তু তাই বলে নাগপুরে শাখা পরিদর্শনের কাজ, পুণায় অধিকারী শিক্ষণ বর্গের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ বন্ধ থাকেনি। রাতের গাড়িতে সাংলী যেতে হয়েছে, রাতের ট্রেনে কোমরে ফিক ব্যথা শুরু হলো— দাঁড়ানো অসম্ভব। এই অবস্থার বর্ণনায় তিনি লিখেছিলেন—"এই পরিস্থিতিতে ভোর ছ'টায় সাংলী স্টেশনে গাড়ি পৌঁছল। স্টেশনে গণবেশে সুসজ্জিত স্বয়ংসেবকেরা প্লাটফর্মে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। নগরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও সেখানে এসেছিলেন। আমি কোমরের ব্যথা কোনোরকমে সহ্য করে, কেউ যাতে টের না পায় এমনভাবে স্টেশনে নেমে পুষ্পমাল্য ইত্যাদি অভ্যর্থনা স্বীকার করলাম। এখান থেকে যেতেই সঙ্ঘস্থানে প্যারেডের কার্যক্রম রাখা হয়েছিল। যেমন তেমন করে সেই কার্যক্রমও পূর্ব নিয়োজিত পদ্ধতিতে পুরো করলাম, কিন্তু এই পরিশ্রমের ফলে কোমরের ব্যথা অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে দুপুরের পর ওঠা-বসাও একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ল। সেই কারণে বিকেলের কার্যক্রম বাতিল হয়ে গেল।"

কোমরের ব্যথার জন্য শুয়ে থাকলেও জ্বর না থাকায় কাশীরাম রাও লিময়ের বাড়িতে স্বয়ংসেবক, নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যাতায়াত লেগেই থাকতো। এই অবস্থায় সাংলী কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের বিদ্যার্থীর একটি বৈঠকও নিলেন। ডাক্তারজী লিখছেন—"মনে হচ্ছে আমার অসুখ সাংলীর লোকদের জন্য লাভজনকই হয়েছে। এই কারণে সাংলীতে পাঁচ-সাত দিন থাকতে হলো। সাংলীবাসীদের এর জন্য আনন্দ হওয়ার দরুন আমার অসুখকে ওরা 'বোলতী বীমারী' (কথা-বার্তার অসুখ) নামকরণ করল"। এ শুধু কৌতুক ছিল না, এ ছিল ধ্যেয় কার্যে আত্ম নিবেদনের এক জাগ্রত নমুনা।

(৭৩)

আর্থিক নিষ্ঠা

সাতারার প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ দাদা সাহেব করন্দীকরকে তার নাগপুরে থাকাকালীন ডাক্তারজী একবার সঙ্ঘ-শাখা পরিদর্শনে নিয়ে এসেছিলেন। স্বয়ংসেবকদের সমস্ত কার্যক্রম দেখে তিনি খুবই প্রভাবিত হলেন এবং স্বয়ংসেবকদের শারীরিক বিভাগের 'ঢাল' কেনার জন্য তিনি একশো টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ১৯৩৫ সালের দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে নাগপুরে তিনি পরলোকগমন করেন। তার সুপুত্র ব্যারিস্টার বিঠঠল রাও করন্দীকর ওই বছরই অক্টোবর মাসে 'ঢাল' কেনার জন্য পিতার প্রতিশ্রুতি মতো একশো টাকা ডাক্তারজীর কাছে পাঠিয়ে দেন। স্বর্গীয় করন্দীকরের ইচ্ছা ছিল যে স্বয়ংসেবকেরা ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রাপ্ত করুক এবং তাদের ব্যবহারের জন্য এই ঢাল দেওয়া হোক।

ডাক্তারজীর চরিত্রে এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল— এক উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থ তিনি অন্যভাবে খরচের কখনো অনুমতি দিতেন না, পছন্দ করতেন না। এটা ছিল তাঁর কাছে এক প্রকার আর্থিক সততা। তখন সঙ্ঘে প্রকৃতপক্ষে ধনুর্বিদ্যা প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, তাছাড়া শারীরিক বিভাগের যে সমস্ত কর্মসূচি তখন গ্রহণ করা হয়েছিল বা প্রচলিত ছিল, কার্যকর্তার অভাবে এগুলি পুরোপুরি সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর মধ্যে নতুন একটি বিভাগ খোলা সম্ভব ছিল না। বিষয়টি তিনি বিঠঠলরাওজীকে একটি পত্র লিখে জানালেন এবং শেষে লিখলেন— 'এ অবস্থায় আপনার প্রেরিত টাকা আপনার নির্দেশিত উদ্দেশ্যে খরচ করা সম্ভব হচ্ছে না, সে কারণে ওই টাকা আমাদের কাছে আমানত হিসেবে জমা রইল। আপনি যেমন বলবেন, সেইমতো তার ব্যবস্থা করা হবে'।

পরবর্তীকালে এই অর্থ দিয়ে বিঠঠল রাওজীর অনুমতি অনুসারে সাতারা শাখার কার্যালয়ের স্থান ক্রয় করা হয়। চারিদিকে অর্থের নানা সমস্যার মধ্যে ডাক্তারজীর এই আর্থিক বিষয়ে অসাধারণ নিষ্ঠা ও সততা ব্যক্তির মধ্যে অদ্ভুত মনোবল তৈরির সামর্থ্য নির্মাণ করে। অনেক কিছুর মতো এমন বিরল উদাহরণও সঙ্ঘ শক্তির নির্মাণের অন্যতম ধারক ছিল।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস